Anjali 2023 Durga Puja Magazine

Greater Binghamton Bengali Association

GBBA Durga Puja

অঞ্জলি ১৪৩০

সূচীপত্র

অলঙ্করণ

মহাব্রতা মণ্ডল~~ প্রচ্ছদ

অনসূয়া দত্ত~~ GBBA Puja(Inside cover page), শুভ বিজয়া ও শুভ কামনা (Back Cover)

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি~~দেব দেবী, প্রতীক এবং অন্যান্য অলঙ্করণ (বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আর ইন্টারনেটের প্রতিচ্ছবির অনুপ্রেরনায় ও অবলম্বনে মৌলিক অঙ্কন) ।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি~~ সম্পাদকীয়

Youth Section

Anya Chatterji~ Drawing~----p.104

Amritakshi Sanyal~Painting & Poem~----pp.105-106

Kriti Bhoomireddi~ Drawing~----p.107

Ella Bagchi ~ Drawing~----p.108

Sureeta Das~ Painting~----pp.109-110

Medha Bhoomireddi~ Painting~----p.111

কবিতা

হর পার্বতীর প্রেমালাপ~~ অনসূয়া দত্ত----pp.1-2

অঙ্কন ধর----pp. 3-4

উল্কা ~ সৌমি জানা----p.5

শীতের অক্ষর~সুবীর বোস---p.6

প্রাগদেশ আর চার্ণির শিল্পরা ও নির্জন নীলাভ গাছ~ আর্যা ভট্টাচার্য----pp.7-8

নির্বাসন~ মলয় সরকার----pp.9-10

তুমি মা পরিব্রাজিকা, কাদাজলে প্রার্থনা গড়ায়, ও কাঙাল~ শিবানী ভট্টাচার্য দে----pp.11-12

আশ্রয়, রূপান্তর , ও জাদুসময়~ হীরক সেনগুপ্ত ----13-14

প্রস্থান~ নূপুর রায়চৌধুরী----15

Art

Urbashee Paul~----pp. 16-17

Ishani Hazra~----pp.18-20

Anjana Guha-Niyogi~----p.21

Amrita Banerjee~----pp. 22-23

Sourav Ghosh~----pp. 24-25

Sudipta Choudhry~----pp.26-27

গল্প

হৃদমাঝারে~ পায়েল চট্টোপাধ্যায়----pp.28-29

এক ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজো (সংগৃহীত)~ দিলীপ হরি----pp.30-31

সাঁকো~ চৈতালি সরকার----pp.32-34

ভালো আছেন~ সাধন কুমার পাত্র----pp.35-37

পশ্চিমের বাড়িতে কিছুক্ষণ~ অঙ্কুর ঘোষ ----pp.38-41

বাঘ শিকার~ সুশোভিতা মুখার্জী----pp.42-45

স্রোতে ফেরা~দেবাশিস দাস----pp.46-49

ভেলু মামার গল্প~ঝর্না বিশ্বাস----pp.50-54

বৃত্ত~ সুদীপ সরকার----pp.55-58

তোতা-কাহিনী~স্বরূপ মণ্ডল----pp.59-64

বাহাত্তর ঘণ্টা~ অচিন্ত্য দাস----pp.65-70

হ্যান্ডশেক~ চিন্ময় বসু-----pp.71-75

বৃত্ত~ দেবতোষ ভট্টাচার্য্য----pp.76-81

অনুশোচনের বৃত্ত~ অনন্যা দাশ----pp.82-87

বিম্ব~ দীপঙ্কর চৌধুরী----pp.88-95

ভুল পথে ?~ প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি----pp.96-103

English Section

War: an inevitability~Sayieed Lumra~----p.112

Desert Moon~Rwitwika Bhattacharya~----p.113

FOR HER~Paramartha Bandyopadhyay~----p.114

India's Mission Kabul~Dilip Hari~----pp.115-116

The Menace~Aniruddha Sen~----pp.117-118

Hello, Popcorn,~Sheema Roychowdhury~----pp.119-120

Working with Different Populations of People and Different Careers~Archana Susarla~----121-122

The Enigmatic Lady~Sajal Kumar Maiti~----pp.123-124

Teamwork~Sushma Vijayakrishna~----125-127

The Abyss~ Gandharbika Bhattacharya~----pp.128-132

The History of the lost Bengali immigration in America~Vaswati Biswas~----pp.133-137

England and A New Beginning~Asish Mukherjee~----pp.138-142

Romancing with mighty River Danube~Champak Sadhu~----143-150

সম্পাদকীয়

আবার এসেছে দুর্গাপূজার শুভ সময় । বাঙালিদের জন্য ধর্মীয় উৎসব হয়েও দুর্গোৎসব বছরের পর বছর ধরে বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ও সকল ধর্মের মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে । সংস্কৃতি এবং ধর্মের এই অভিনব সমন্বয় আর কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায়না ।

আমরা আবারও শারদীয়া অঞ্জলি ১৪৩০কে সাহিত্য ও শিল্প-সম্ভারে সাজিয়ে নিয়ে এসেছি আপনাদের পূজার দিনগুলিকে সাহিত্য পাঠের আনন্দে ভরিয়ে দেবার জন্য । প্রতিটি জাতির মতই বাঙালিদেরও নিজস্ব গল্প বলার বহুকালের ঐতিহ্য আছে । এইসব রূপক কাহিনী বা উপকথার সাহিত্য-মূল্য কোন কালেও বোধহয় পুরনো হবার নয় । মা দুর্গাকে ঘিরেও আছে অনেক কিংবদন্তী। পুরাণের গল্প ইন্টারনেটে এখন সহজেই মেলে তবে পৌরাণিক কাহিনীর মৌখিক প্রচলন ইন্টারনেট সৃষ্টির অনেক অনেক আগে থেকেই ছিল ।

দুর্গাকে অনেক নামে ডাকা হয়; যেমন পার্বতী, উমা , গৌরী, সতী এবং আরও কত সব সুন্দর সুন্দর নাম । মা দুর্গা কে আমরা কল্পনা করতে শিখেছি একটি পরিবারের মেয়ে হিসেবে, যে বিয়ে হয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরের দেশে, কৈলাস পাহাড়ের কোলে বোধহয় সেই দেশ । আকাশে মেঘের আড়ালে হয়ত সেই দেশ আছে । দুর্গা বছরে একবারই মাত্র সুযোগ পান ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিজের মা বাবার কাছে, এই পৃথিবীতে মাত্র কদিনের জন্য আসবার । সেই কয়েকদিন চলে এই মহোৎসব- দুর্গাপূজা । আবার বিজয়া দশমীর দিন মায়ের মূর্তি গঙ্গায় ভাসান দিয়ে আমরা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করি পরের বছর মায়ের আগমনের আশায় , বলি "আসছে বছর আবার হবে "।

আজকে দুর্গাপূজার প্রারম্ভে আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি মা দুর্গাকে ঘিরে এক অতি প্রচলিত, বহুজনের প্রিয় গল্প; দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনী ।

দক্ষ নামে এক ভীষণ ধার্মিক এবং শক্তিশালী রাজা ছিলেন, আর তাঁর সতী নামে একটি মেয়ে ছিল। সতী তার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিব বা রুদ্রকে বিয়ে করেছিলেন । এদিকে দক্ষর শিবকে সুপাত্র হিসেবে একটুও পছন্দ ছিলনা নিজের মেয়ের জন্য । এই বিয়েতে দক্ষ মেয়ে ও জামাই দুজনের উপরই খুব রেগে যান ।

এরপর যখন দক্ষ নিজের বাড়িতে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন, তিনি ইচ্ছে করেই সতী ও তার স্বামী ছাড়া অন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানান। সতী, তার বাবার আচরণে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন কিন্তু তবুও তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিনা আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন ।

এর ফল ভাল হয়নি মোটেই । যজ্ঞের সময়, দক্ষ সতীর স্বামী শিবের উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্য করতে শুরু করেন। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী নিজের শরীর থেকে যজ্ঞাগ্নি সৃষ্টি করেন এবং ক্রোধে নিজের দেহ ত্যাগ করেন।

সতীর মৃত্যুতে তার স্বামী শিব বলাই বাহুল্য প্রচণ্ড ক্রোধে দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে দিলেন ।এর পর শিব রাগের চোটে সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে স্বর্গ ও মর্ত জুড়ে ধ্বংসের নৃত্য নাচতে শুরু করেন ।

শোনা যায় এই দুঃসময়ে ভগবান বিষ্ণু আসেন (যাকে রক্ষাকর্তা এবং রক্ষক বলা হয়) শিবের ক্রোধ শান্ত করতে। বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো করে কেটে ফেলেন। সতীর দেহের অংশ এবং গহনার টুকরো ভারতের ও তার আশেপাশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে । বিষ্ণু সতীকে তখন উমা নাম দিয়ে নতুন জন্মে পুনরুজ্জীবিত করেন। শিব এর পরে শান্ত হলেন এবং শান্তি ও সম্প্রীতি আবার ফিরে এল স্বর্গ ও মর্তে । এই হচ্ছেন আমাদের উমা, বা দুর্গা যিনি প্রতি বছর শরৎকালে দুর্গা পূজার সময় কদিনের জন্য সন্তানদের সাথে পৃথিবীতে আসেন।

আশাকরি আপনাদের পূজোর দিনগুলি প্রিয়জনদের সঙ্গে অনেক আনন্দে কাটুক ।
অঞ্জলির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভ বিজয়ার প্রীতি, ও শুভেচ্ছা, জানাচ্ছি।
আপনারা অনেকেই গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পাশে থেকে সাহিত্য ও শিল্পের অবদানের দ্বারা শারদীয়া অঞ্জলি কে সমৃদ্ধ করছেন, তাঁদের জন্য অনেক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন রইল । নতুন লেখক লেখিকা ও আর্টিস্টদেরও ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাচ্ছি ।
শিশু বিভাগের শিল্পী কজন কে তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি ।আশা করবো ভবিষ্যতে তাদের প্রতিভা যেন যথাযথ স্বীকৃতি পায় ।
নমস্কারান্তে... ।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakti_Pitha

হর পার্বতীর প্রেমালাপ

অনসয়া দত্ত

ভোলা –
বলি ও গৌরীরাণী
বছর বছর তোমার কি এই
মর্ত্যভূমিতে না গেলেই নয়?
ভাব কি তখন আমার কি দশা হয়?
জানি সেখানে তোমার
আলোর রোশনাই
হাসি আহ্লাদ, পূজা হোম,
ঢাকি, মন্ডা মিঠাই
কতো উপাচার সাজানো প্রসাদ
কিন্তু আমার ঘরে যে
নেমে আসে চরম বিষাদ॥

গৌরী -
৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬০ দিনই
তো তোমার পাশে পাশে কাটাই
এই পাঁচটা দিনের জন্য নাহয় পেলাম
একটু বাবা মায়ের ঠাঁই।
সেই চেনা বারান্দা, জানলার ধার
সংগী সাথীদের সংগে আহার
নিজ হাতে লাগানো শিউলির চারাটা
দেখি গিয়ে আজ কতো বড়ো হলো
ছোট্ট মিনিটারে কে দুধ খাওয়ালো॥

ভোলা-
সেখানে তোমার ভাই বোন আত্মীয় স্বজন
আহারে বাহারে ভুলিয়ে রাখবে সারাদিন।
কিন্তু আমার ঘরে যে ঠান্ডা চুলা
কে রাঁধে কে বাড়ে এই পাঁচদিন।
ঘুরে বেড়াই আমি শ্মশানে শ্মশানে
নেশা ভাঙ করি, থাকি আনমনে।

গৌরী-
আহা, আমি তো এই যাব আর আসব
এসে আবার আমার ভোলারে ভোলাব।
নন্দী ভৃংগীরে রেখে গেলাম
তারাই করবে তোমাকে সেলাম।
জানো নাকি তুমি যেখানেই যাই
মনের গভীরে তোমারেই চাই।
প্রাসাদ প্রসাদ যতোই পাই না কেন
এই কুঁড়েঘরই মোর সংসার জেনো॥
ভোলা-
জানি গো জানি, কি করে করি
যেতে গো বারন,
আছে তোমার অনেক কারন।
মা বাপ তোমার পথ চেয়ে থাকে
বাকী ওরা যারা মা বলে ডাকে।
বারো মাসেতে এই একবার
অধিকার নেই তোমাকে রোখার।
তার চেয়ে বরং এসো দোঁহে মিলে,
আমরা দুজন মাতি প্রেমালাপে।
দেখোনা কেমন জ্যোৎস্নার আলো
ভাসিয়েছে দিক, নেই কোনো কালো॥
গৌরী-
আজ তবে এসো পূর্ণিমার চাঁদ সাক্ষী রাখি
জ্যোৎস্নার আলো মন ভরে মাখি -
দাও বেঁধে চুলে খোঁপাটি আমার
সাধের ফুলদুটি দিও গুঁজে আর -
নরম বাতাসে এনেছে আবেশ
চল মোরা দুজন মাখি তার রেশ॥

Sketch – Anasua

কবিতা মূল ভাবনা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসী কাব্যগ্রন্থের ‘নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ’ দ্বারা প্রভাবিত।

অঙ্কন ধারনা - https://www.facebook.com/profile.php?id=100065032322583

অনসূয়া দত্ত ইথাকা, নিউ ইয়র্কের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে কর্মরতা, অনসূয়া ইদানীং কালে তার শিল্পী সুলভ চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আগ্রহী। এই রচনাটি তারই একটি ছোট প্রয়াস।

অঙ্কন ধর

১

সে ভাবে কোথায় কে ভালো আছে?
নির্ঝঞ্ঝাট বলতে এই ডুয়ার্সের মাতাল অন্ধকারে
ডুবে আছে পুবের আকাশ।
এখানে,
খানিক ঝিমিয়ে থাকা ঈশ্বরের কাঁধ,
আগুন শরীর জুড়িয়ে নেয়,
কৈলাশ মৌনতায়।
আমিও খুঁজি তাঁকে।
স্মৃতিমঞ্চ থেকে শবসাধনায়
অগণিত অস্ত্রের ঝংকারে
বালি থেকে পাথরে
সর্বত্র শুনি দুর্বোধ্য স্তব।
আমার দেবতা তখন
এসবের থেকে বহুদূরে
বসন্তের সঙ্গে তরঙ্গহীন আড্ডায়...

২

এক এক ধরণের জল
পায়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়।
পিছল জমি আঁকড়ে
ঘর পথে ফেরে,
একলা, বিষন্ন রঙের মাটি।
জ্যোৎস্নার শহর, তোমার
ঘাসে পিঠ রেখে
আকাশের রং বদলাই আঙ্গুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
মনে করে দেখো,
আমার এই আদিম উৎসবে
একদিন তুমিও পুঁতেছিলে সঞ্জীবনী বট
মেরুদন্ড বেয়ে
কান্নাকে থামিয়ে দিয়েছিলে
ঠোঁটের খুব কাছাকাছি
বলেছিলে, এবার থেকে
যত মৃত্যু, তা শুধু আমার হয়ে থাক।

৩

কথা ফুল হয়ে ঝরে।
মাঝির নীল জল,
আজ ঈশ্বরীয় গন্ধে একাকার।
আমি শরীর ভিজিয়ে রাখি
কবিতা স্রোতে,
পুরোনো প্রেম যদি আবার
ওঠে জেগে
ভোরের বাসন্তী কোলাহলে।
তাকে বলবো,
দুহাতে টেনে নাও মুখ
ঠোঁটে দাও
মধ্যযুগীয় চুম্বন।
আমার কানে কানে বলো
হৃদয়ের কোন স্থান ছুঁলে,
অসুখ, ঘুম হয়ে যায়।

৪

সত্য তো এটাই যে সমস্ত যাত্রা মিথ্যে।
শরীরে ৬০ ভাগ জল
আর বাকি ৪০ শতাংশ হলো, শেতাঙ্গ সংশয়।
অনেক শহর ঘুরে দেখি
সমস্ত আকাশেরই চূড়োয়,
বসে থাকে মরহুম চাঁদ
জোৎস্নার আবেশে
সে ডুব দেয় সর্পিল সলিলে।
এই সব ছেড়ে যাবে কোথায়?
এক যদি না বোলো
তোমার অপেক্ষায় আছে
মণিকর্ণিকার সঞ্চিত আগুন।

অঙ্কন ধর, কলকাতায় একটি তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির কর্ণধার, এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং - এর অধ্যাপক, ভালোবাসে অচেনা, অজানা জায়গাতে নতুন করে নিজেকে খুঁজে পেতে ভালোবাসে গান, কবিতা, ধ্যান। বাড়ি, বেহালা, প্রেম, এই শহর।

উল্কা

সৌমি জানা

তোমায় দেখে ভেবেছিলাম
ছায়াপথে বনবন করে ঘুরতে থাকা
এক জ্বলন্ত উল্কা
চোখ ধাঁধানো ফুলকি তে
আলোকময় করেছিলে
আমার রাতের আকাশ

তোমার দীপ্তি তেজ আর ছটায়
ভুলেছিলাম বারোমাস্যা
যাবতীয় হিসেব নিকেশ
মিলেছিল শূন্যে এসে
প্রভাতী প্রশান্তি দিনভর
রেশ নেমে যেত রাত বেয়ে

কক্ষ বদল করে
আজ তোমার অন্য আকাশ
প্রদক্ষিণের শর্ত ভিন্ন
শুধু তোমার দিয়ে যাওয়া
বেহিসেবী দীর্ঘশ্বাসে
আমায় ঘিরে বাতায়ন পুড়ে ছাই

যদি কখনো আস ফিরে
সেই ফেলে যাওয়া পথে
ছাই উড়িয়ে যদি হাতড়াও
ভাঙা পাঁজরের হাড়
খুঁজে পাবে হৃদয়জোড়া গর্ত
উল্কাপতনের চিহ্ন বইবার l

সৌমি জানা নিউ জার্সির বাসিন্দা । সৌমি কবিতা ও গল্প দুটিই লেখেন। তার লেখা সাম্প্রতিক কালে আনন্দলিপি , কিশলয় , পরবাস , প্রবাস বন্ধু, সংবাদ বিচিত্রা ,রুট ৬৬, অঞ্জলি , গল্প কুটির ,কল্লোল ইত্যাদি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত
হয়েছে। লেখালিখি ছাড়াও বাচিক শিল্প ও নাটকের চর্চা করেন। ছোটদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বিশেষ ভালোবাসেন। সৌমির পরিচালনায় ছোটদের নাটক - রতনগড়ের রতনজোড় , লক্ষণের শক্তিশেল , পদিপিসির বর্মিবাক্স ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

শীতের অক্ষর

সুবীর বোস

লাঙল দুর্বল হলে কৃষিকাজ যন্ত্রণা বাড়ায়
পড়ে থাকে ম্লান মাঠ আর কিছু বাতিল আদর
প্রতিবেশী ডাকঘরে চিঠি এলে আমার পাড়ায়
ম্লান মাঠ নড়ে ওঠে মৃদু কাঁপে বাদামি চাদর

তবু মাঝে ক্রিয়াপদে প্রাণ আসে যেটুকু পরম
সে-ও যদি মুখরায় থেমে যায় – আমি চুপ থাকি
অবহেলা বুঝে নিয়ে সরে গেলে খুদকুঁড়ো গম
পড়ে থাকে অলস সঞ্চারী মায়া, পড়ে থাকে ফাঁকি

লাঙল দুর্বল হলে কৃষিকাজে – টের পাই জ্বরে
প্রকৃত আলাপ থেকে মূল সুর সরে গেছে দূরে
মৃদু দেখি, থার্মোমিটার লিখেছে শীতের অক্ষরে

"জেনো, লাঙল পুরনো হলে বাজে – আদ্যন্ত বেসুরে" ।

সুবীর বোস

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ই-কেরাণি। সময় পেলে কিছু লেখালিখির চেষ্টা করি। কিছু ছাপা হয় – কিছু চাপা পড়ে থাকে আমার কম্পিউটারে এবং সময়ে-সময়ে তারা হারিয়েও যায়। লেখালিখি করি বটে – তবে বিশ্বাস করুন আমার এ ব্যাপারে পড়াশোনা একদমই নেই। খুব পছন্দ করি আড্ডা মারতে। আর এই আড্ডা মারতে মারতেই যা কিছু একটু অন্যরকম ধরা দেয় আমার মননে – তাকেই তুলে আনার চেষ্টা করি কলমে। বাকিটা জানেন প্রিয় পাঠককুল।

কবিতা যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে – দেশ, কৃত্তিবাস, কৌরব, পরবাস, কবি সম্মেলন ইত্যাদি;

গল্প যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে – দেশ, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, আনন্দমেলা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, শুকতারা , পরবাস ইত্যাদি;

ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে পরবাস এবং অবসর ওয়েব ম্যাগাজিনে।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দু'টো – আঙুলের সংলাপ ও আমার মহড়াগুলো।

প্রকাশিত গল্পের বই – ভাঙা কলমের আন্তরিকে প্রথম লেখালিখির চেষ্টা – ডিসেম্বর, ২০০৫ এক শীত সন্ধ্যায়।

আর্যা ভট্টাচার্য

১

প্রাগদেশ আর চার্ণির শিল্পরা

যুদ্ধের কালো ধোঁয়া সন্তর্পণে
আসে চুপিসারে। মস্তিষ্ক ট্যাম্পার করে। হৃদয়ের খোপ শূন্য করে যান্ত্রিক
বারকোড ভরে দেয় অতি সন্তর্পণে।
স্বপ্নের আড়াল নিয়ে চার্ণি সেকথা বুঝি বুঝেছিল; তাহাদের প্রতিচ্ছবি
তাই কি সে বানিয়েছে প্রাগদেশে আগে !

কৃষ্ণ বর্ণ অন্ধ শিশু কয়েকটি আছে। যুদ্ধের ধোঁয়া গায়ে মেখে
কালকেউটের মতো ইস্পাতের দন্ড বেয়ে
নামে আর ওঠে । ঘাসের সবুজ খুঁজে বিষাদ মাখানো বিষ ঢালে।
অথবা কি শিশু একটিই?
ডাইনির যাদুর খেলায় এক ছাঁচ বহু মনে হয়?
হামাগুড়ি দিয়ে সে বা তারা অবিরাম ওঠে আর নামে । অদৃশ্য কোন্
ক্রূর হাসি গোপনে ঠোঁটের কোনে ঝোলে!

তারা কী মায়ের কোল খোঁজে? নষ্ট হয়ে গেছে নাকি ? পেয়ে গিয়ে
ডাকিনীর গূঢ় কোনো অন্য আশ্রয়!

এসব রহস্য বোঝে মৃত এক বুড়ো ঘোড়া।
হেঁটমুন্ড ঊর্ধ্বপদ মিউজিয়ামের ছাদে পাশবিক দাঁত গুলি বের
করে , যুদ্ধের কৌশল সব বুঝে ফেলে উচ্চকিত হাসে আর মাথা নেড়ে
ঘোরে।
মানুষকে ভালোবেসে , মানুষের পাশে যাবে
বলে, ভুল করে ওয়েন্সলেস বসেছিল ঘোড়ার
উপরে।

ঘোড়া উল্টো ছিল। আর মৃত। নামবার রাস্তা ছিল ব্যারিকেড ঘেরা। বন্ধ
একেবারে।
উল্টো

মৃত ঘোড়া আর অন্ধ শিশু, অথবা শিশুরা
মানুষকে কব্জা করে প্রেতলোক যেন।
সেই বাসস্থান ঘিরে বোমারু বিমান হয়ে
বাঁই বাঁই পাক খায়, ঘোরে
আর ঘোরে;

নিভে যাওয়া কালো তারা ঘিরে
অন্ধ নষ্ট ভূতে পাওয়া এই যে পৃথিবী,
থামার কৌশল ভুলে সে ঘূর্ণনে ছেঁচড়ে
ছেঁচড়ে চলে ।অন্য পৃথিবীর কথা ভুলে
গেছে বাসিন্দারা।সে কী তবে যুদ্ধ
ডাকিনীর হিংস্র মায়ার ফাঁদে পড়ে !

কাফকার মাথা শুধু একান্ত একাই
দিনরাত কোনটা সত্য কী বা মিথ্যা
সন্ধানের গূঢ় প্রচেষ্টায় অবিরত নিজেকেই
ভাঙে আর গড়ে।

চার্ণি-প্রাগদেশের বিখ্যাত স্থপতি ডেভিস
চার্ণি

আর্যা ভট্টাচার্য

২

নির্জন নীলাভ গাছ

মধ্যযামে বিদেশী পথের রেখা ধরে একটি মনুষ্য মূর্তি একা হেঁটে যায় । আঁধারকে আরও গাঢ় করে ,পাখির পালক হয়ে মৃদুমন্দ বরফেরা ঝরে ।
অর্ধস্বচ্ছ মায়াবী আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক গাছ । নির্জন একাকী দূরে, অন্তেবাসী যেন।
নির্জন শরীর জুড়ে তার টুনি বাল্ব জ্বলে আর জ্বলে-
নীলাভ জোনাকি মনে হয়।
সত্যিই কি টুনি আলো জ্বলে? কে পারে বলতে ?
কে বা বলতে পারে !
যে সব নক্ষত্র রাজি আমরা দেখিনি চোখে- যোজন যোজন ব্যাপী নির্জনতার পথ বেয়ে, গোপনে এসেছে নাকি নেমে ? মাটির গাছের আকর্ষণে !
হয়তো আসবে নেমে নেফারতিতির আত্মা আজ-
এই শীতে, একাকী পথের পাশে বিদেশ বিভুঁয়ে। এখানেই হবে দেখা তিন হাজার বছরের প্রতিশ্রুতি শেষে !
সে সব কোমল ব্যথা মানুষটি ভুলেছে সে কবে!.
..তথাপি শীতের রাতে
কী এক দুর্বোধ্য তাড়নায় , উষ্ণ ঘরের শয্যা
ছেড়ে , একটি মনুষ্য মূর্তি ডিসেম্বরের শেষে
নীলাভ আলোর ডাকে জনহীন বিদেশী রাস্তায়
আনমনে একা একা ঘোরে।

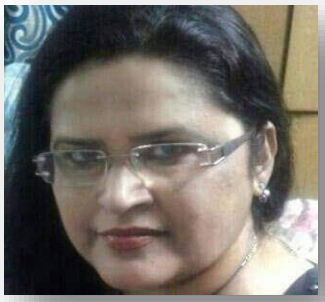

দর্শনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়া, সাহিত্য, ভ্রমণ ও ভাষা শেখার আগ্রহ রয়েছে আর্য্যা ভট্টাচার্যের। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ' পরবাস' । তার লেখা কবিতা ও ছোটোগল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মলয় সরকার

নির্বাসন

আমি কতদিন দেখিনি
ঝকঝকে নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ,
কতদিন ছুটি নি মেঘের ছায়ার সাথে
মাঠ পেরিয়ে কুল ছাড়িয়ে,
মাঠের বাঁশির সুরে মাতাল হই নি কতকাল,
সে গান শুধু পুষে রেখেছি আদরের
বেড়াল ছানাটির মত
বুকের ওম দিয়ে, হৃদয়ের ভালবাসা জড়িয়ে,
প্রথম সূর্যের অরুণ কিরণ গায়ে মেখে
উদাস দুপুর ছাড়িয়ে

বিকেলের জুঁই মালতীর মায়ায় জড়িয়ে মাতাল হই নি কতদিন।

আজ এখানে সকাল আসে,

দুপুর আসে, বিকাল সন্ধ্যা গড়ায় চলন্ত যন্ত্রের মত নিয়ম মেনে,
কিন্তু নিদ্রাহীন হলুদ রাত্রি থাকে হিংস্র শ্বাপদের জিঘাংসামিশ্র চাহনির মত

লোলুপ দৃষ্টিতে অবিশ্রাম তাকিয়ে।

আমার ভয় হয়, ধূ ধূ সাদা ভয়-
কফিনের চাদরের মত;
চারিদিকে দেখি মায়াবী কপাট-
ভেঙ্গে ফেলে প্রাণপণে ছুটে বেরোতে চাই-
কিন্তু পালাব কোথায়?
দিশাহীন নির্দয় চারিপাশ ভ্রুকুটি হানে,
কঠিন পাহারার শৃঙখল বেজে ওঠে
ঝন ঝন ঝন ঝন–

অবসন্ন আমি -
অসহায় বুকের মাঝে ঝাপটাই ডানা
পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যবিহঙ্গের মত,
চোখে ভেসে ওঠে
সাদা সাদা পাল তোলা
সারি গানে ভরা মরালীর মত ভেসে থাকা
উদাস তরণীর সারি,
আধো তন্দ্রার গলিঘুঁজি দিয়ে
ভেসে আসে ঝুরুঝুরু হেঁটে যাওয়া
হাওয়ার শিরশিরে
ঝিমধরানো গানের একটানা সুর-
ম্লান ছলোছলো ঢেউ ওঠে আর ভেঙে পড়ে,
অবসন্নতা বেড়ে ওঠে

হতাশায় আচ্ছন্ন হয় মন।

মনের অন্ধকার কোণ থেকে
তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা শানিত ছুরির ফলার মত
ছিটকে বেরিয়ে আসে,
কতদিন আর কতদিন এ নির্বাসন!

মলয় সরকার

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক। লেখালিখি বহুদিন, দেশে বিদেশে বহু পত্রপত্রিকায়, মূলতঃ গল্প, কবিতা ও ভ্রমণকাহিনী।উদ্যানচর্চা, পড়াশোনা ছাড়াও একটি নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ও স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার।নেশা দেশে বিদেশে ভ্রমণ।

শিবানী ভট্টাচার্য দে

১

তুমি মা পরিব্রাজিকা

মা তুমি পরিব্রাজিকা কত শত যোজন চলেছ
অনেক ভুবন গড়ে বালি কাদা মাটি ছেনে ছেনে
অনেক ফুলের রঙ চাঁদনীর রুপোর মিশেলে
ঝড়ের নীড়ের মত ভেঙ্গে গেলে যন্ত্রণা কেঁদেছ
নাড়ী থেকে কত দূরে পায়ে পায়ে এগোলে জননী
আফ্রিকার উপকূল আরব ও ককেশীয় ভূমি
পুরাতন সভ্যতার দীর্ঘপথ ঘুরে ঘুরে নতুন জগৎ
আবার নূতন ঘরে নব গর্ভে নূতন প্রাণের জন্ম দিয়ে
তুমি ধাত্রী ধরে রাখ পালন পোষণে । নরের আঘাতে
ভাঙ্গে বারবার বাসা, তুমি শুধু এগোও---এগোও ।
মা তুমি পরিব্রাজিকা আবর্তনী পুরাতন পৃথিবীর মত
আদিম বৃক্ষের তলে ইভ, নির্বাসিত স্বর্গোদ্যান হতে
আদি পুরুষের পাপে--- সেই থেকে ক্রমাগত চলা
বানিয়ে নতুন নীড়, দিয়ে তৃষ্ণাজল অন্ন আশা
নির্বাসিত স্বভূমির থেকে, তবু পেছন ফেরোনি।

৩

কাঙাল

কাঙালের মত

একএকটা আশায় শুধু বেঁচে থাকা

নির্জীব জীবিত

তন্দ্রার ভেতর আধো জেগে শুয়ে থাকা।

দেহি দেহি মন্ত্র শুনে

ভিক্ষাঝুলি নিয়ে ছুটে যাই,

কোথায় কী যেন দিচ্ছে,

খুদকুঁড়ো যদি কিছু পাই

আভূমি নোয়ানো মাথা প্রার্থনায়

মহা মহা পুণ্যাহের উৎসর্গ থালায়

সব আশা থরে থরে রাখা।

২

কাদাজলে প্রার্থনা গড়ায়

এখন মানতকাল, দেবতার দোর ধরে চলা,
অজস্র প্রার্থনা ওড়ে, রূপ জয় যশ শত্রুনাশ।
প্রার্থনায় কামনায় কালো হয় নির্মল আকাশ ।
অক্ষম বিলাস সাথে সাজানো নৈবেদ্য থালা থালা ।

কোন রূপ কারে শোভে, কোন জয় চিরস্থায়ী জিত,
কোন যশ অক্ষয়িত, কত ধনে কার তৃপ্তি হয়,
কোন শত্রু কোথা থাকে, কে বা শত্রু কিসে চেনা যায়,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে মনে, সব অগোচর অজানিত ।

চাওয়াপাওয়া সব তাই বুঝি ভুলভাল হয়ে যায়,
হৃদয় ওঠে না ফুটে, জোর করে খোলা পদ্মকুঁড়ি---
রং-রাংতার উপাদানে বরাভয় মূর্তিখানি গড়ি
চারদিন পুজো শেষে কাদাজলে প্রার্থনা গড়ায় ।

শিবানী ভট্টাচার্য দের জন্ম আসামের বরাক উপত্যকায়।ইংরাজিতে এম এ। বহুবছর অরুণাচল প্রদেশে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে কলকাতায় বাস করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ দুটো, একটি উপন্যাসিকা 'ভাটি গাঙের নাইয়া', অনূদিত উপন্যাস 'আয়স কাল'।

হীরক সেনগুপ্ত

১
আশ্রয়

শ্রান্ত আকাশ, নত সমুদ্র তীরে।
গ্রহণ এসেছে কুয়াশা বারিধি শেষে।
এই হোক তবে আপাতত আশ্রয়।
নিরূপায় রাখো, আমাকেও ভালোবেসে

২
রূপান্তর

এই জালানায় আমি নিরূপায়
বসি
স্নিগ্ধ সকাল পাখিদের খোঁজে
এসে
ইঁট পাথরের যাবতীয় তাস
ঘরে
সূর্য দীঘল রূপকথাগুলি
ভাসে
বন্দর ছেড়ে জাহাজ দিয়েছে
পাড়ি
গাঙচিল ঢেউয়ে জলের লেফাফা
হাসে
শুভেচ্ছা বানী,'এবারের মত
যাই'
পুনরায় কোনো ভ্রুণের নতুন
দেশে,
পূর্ণ বিভায় তৃণ অঙ্কুরে
দেহ
আনন্দ ঘন বৃক্ষাবয়ব
বেশে

৩
জাদুসময়
কত কথাই বলছি একা,
শেষ দুপুরে
অচিন্ত্য রাত,পরীর সঙ্গে
ভবঘুরে
তুমিই কী তার সঙ্গী ছিলে
রাত মোহনায়
বটের হৃদয় তরঙ্গময়
অবুঝ খোলায়

অথবা কোন জাদু সময়,
আগু পিছু
ক্ষেত পাহারায় কাকতাড়ুয়া,
মিথ্যে কিছু
অন্ধকারে ছেঁড়া আলোয়
পক্ষীশাবক
একটি রাতের জীবনই সই,
অমূল্য হোক

চোখের সামনে দুলতে থাকে
পাহাড়ি পথ
বাঁকের মুখে ঘোর অচেনা,
নানান শপথ
ইরেজারের ঘসায় মোছা,
বৃত্তযাপন
শিল কুড়িয়ে ভর্তি দেখি
জলের জীবন

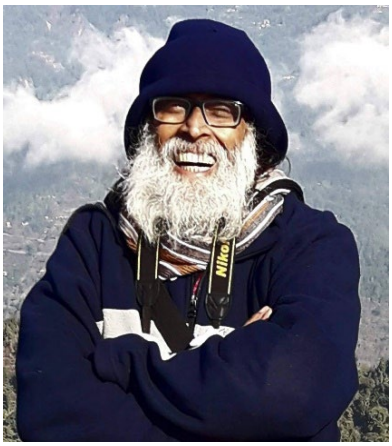

হীরক সেনগুপ্ত

পেশা: শিক্ষকতা, শখ: গান, ডুডলস, হাতের লেখা, ভ্রমণ, ফোটোগ্রাফি, লেখা ।

প্রকাশিত: পরবাস, হিজবিজবিজ বাংলা ব্লগ, চার নম্বর, মাধুকরী, প্ল্যাটফর্ম,ও সপ্তডিঙা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত।

মেয়েদের গল্পের বই' সপ্তর্ষি প্রকাশন ,কোলকাতা, হতে প্রকাশিত।

নূপুর রায়চৌধুরী

প্রস্থান

হ্যাঁ, পারতাম, চাইলেই পারতাম
ঘোলা জলে নেমে কাদা ঘাঁটতে
সকলে বলেছিল
তবেই নেওয়া হত যোগ্য প্রতিশোধ
বোঝা যেত ধমনীতে বয় তাজা শোণিত
খুশি হতে তোমরা
রোজ রোজ নিপীড়িত হও যারা
করিনি তা,
তার বদলে
ফিরে গেছি অরণ্যের কোলে
গাছ ফুল লতাদের নিভৃত কন্দরে
ভুলিয়ে দিয়েছে ওরা
অভিমান, ঘৃণা, রাগ ও জেহাদ
অমৃতবারি সিঞ্চনে
ঘুচে গেছে
আমার সেদিনের কলঙ্কিত অবস্থান
নির্লিপ্তির সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
আজ আমি তাই
শুধু জীবনের জয়গান গাই

নূপুর রায়চৌধুরী, জন্ম, পড়াশুনো কলকাতায়। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবনে শিক্ষকতা করেছেন। আমেরিকায় বায়োমেডিক্যাল সাইন্স-এ গবেষণায় যুক্ত| লেখালিখির নেশা| । বর্তমানে মিশিগানের বাসিন্দা।

Art

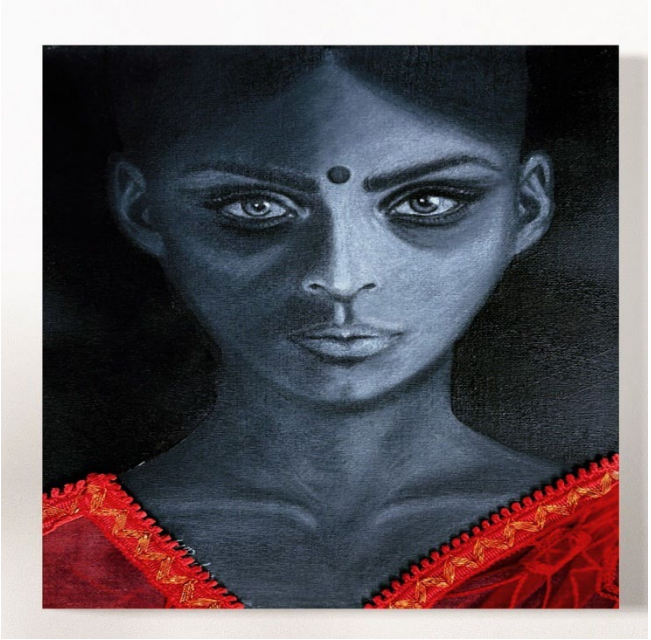

Urbashee Paul

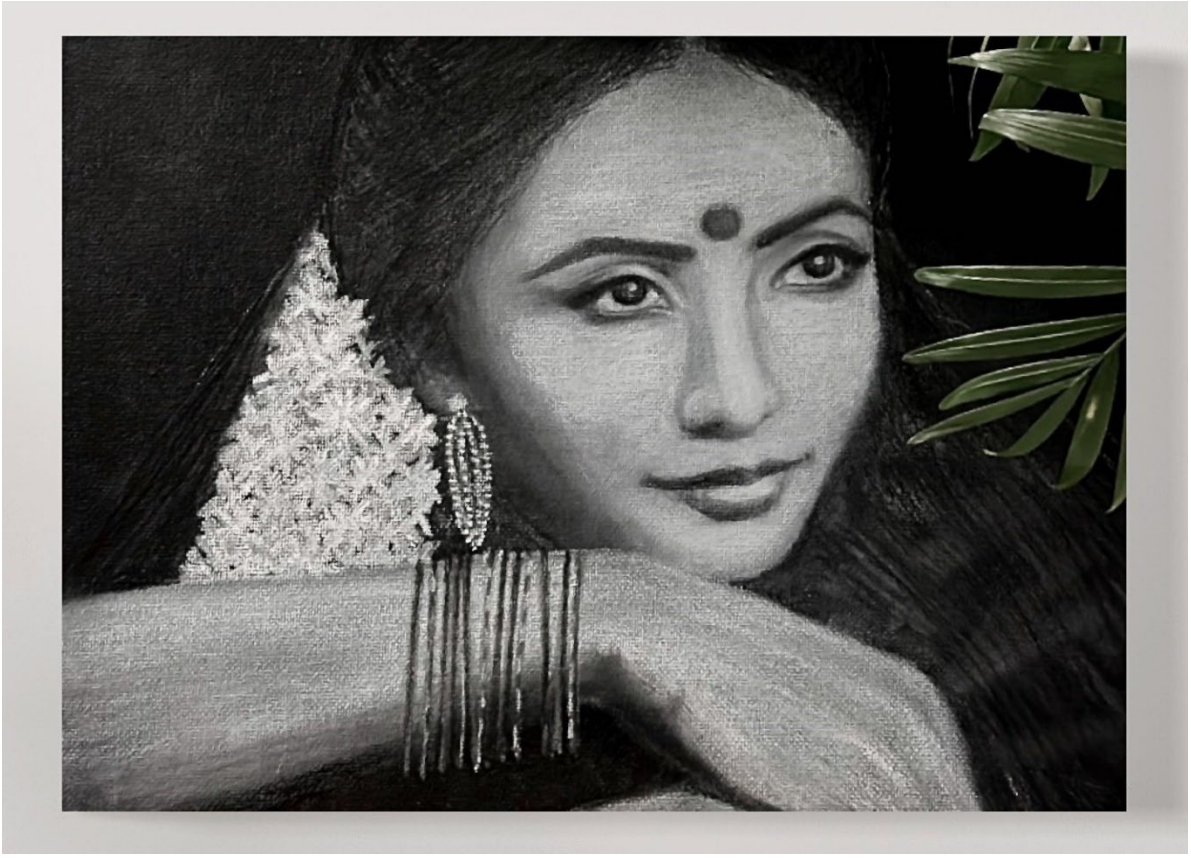

Urbashee Paul

Urbashee Paul is a self-taught New York City artist specializing in charcoal drawing and acrylic painting. Her subjects evoke deep emotions in the viewer: hope, determination, love...

The subjects featured here include a portrait of her mother and two other unnamed South Asian brides. It is up to the audience to uncover the stories behind their eyes.

The artist holds a Ph.D. in Economics from Northeastern University and works as an economist at a litigation consulting firm in Manhattan. You may visit www.urbasheepaul.com to view Urbashi's other art pieces.

"Unlocking Barriers "

Ishani Hazra

"Reflections"

(watercolour)

Mahisadal , West Bengal

Ishani Hazra

Born and brought up in Kolkata, Ishani is a service professional who pursues art as her passion.

She loves exploring nature and old ruins and seeks beauty in mundane and ordinary things.

She is also an ardent dog lover, and all proceeds of her artwork sale are for the welfare and treatment of the strays in her neighborhood.

Ishani Hazra: “My bags are packed, am ready to go.” (watercolour).

Ishani Hazra:” Dilapidated memories”

(watercolour)

Ishani Hazra: “Carefully careless”

(Watercolour) Mahisadal Rajbari, West

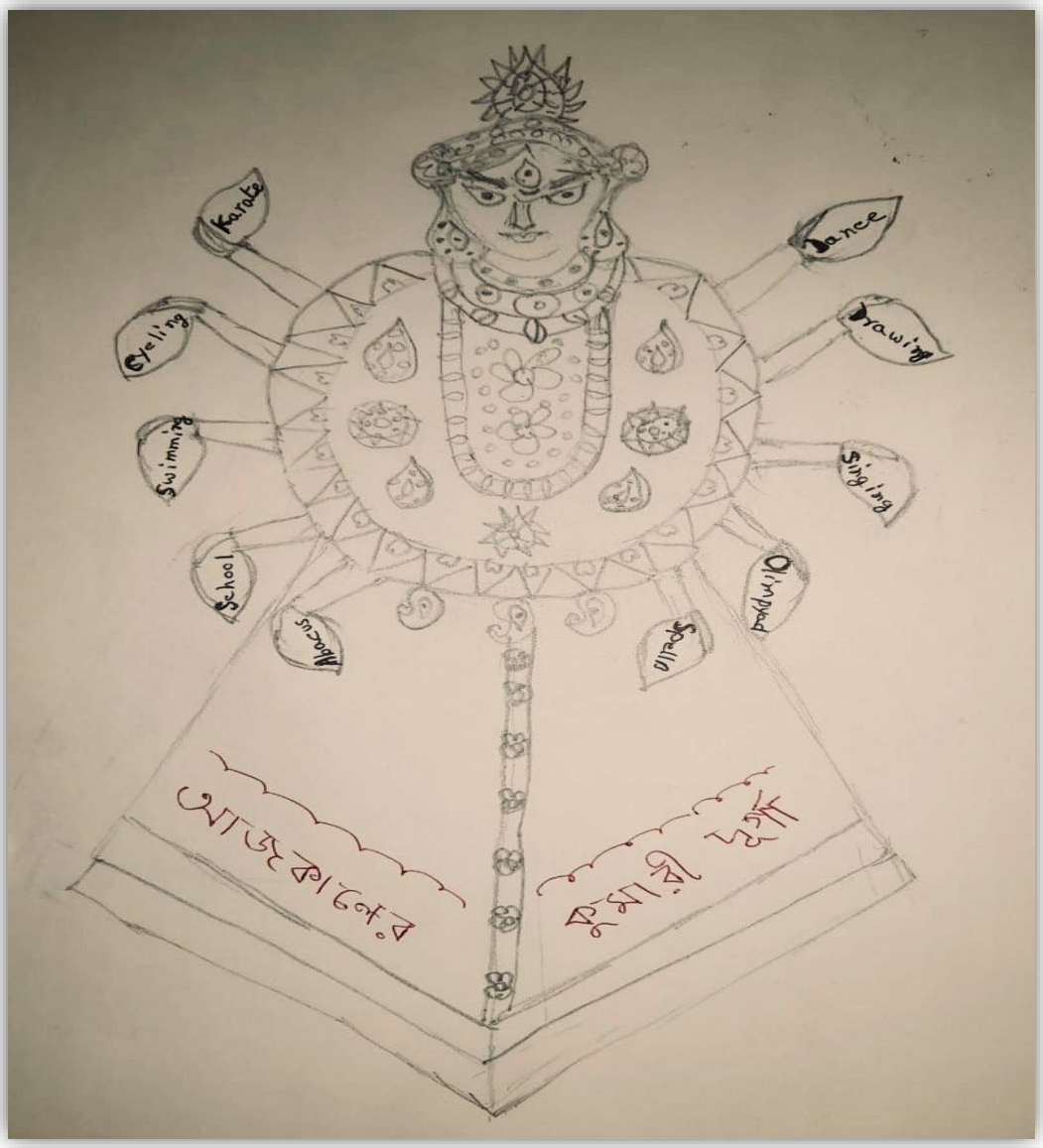

Anjana Guha-Niyogi was born in Shillong, India. She graduated with honors in economics from Ladykin College in India.

She worked for Survey of India, Central Government of India. She has been living in Kolkata, India, for many years.

Presently, she passes her time enjoying the company of her precious granddaughter, Dishani.

The Seasons

Paintings by Amrita Banerjee

Amrita Banerjee

Amrita Banerjee is from Kolkata; she uses watercolor and oil for her paintings.

Alpona on Sora & Cardboard by Sourav Ghosh

Sora is a terracotta plate used as a wall- mural painting.

Sourav Ghosh is a Kala Bhavan graduate from Santi Niketan

Sourav Ghosh has been painting exquisite Soras for over five years now and has started doing Alpona paintings on Cardboard too.

Recently he had his first Sora exhibition at the invitation of Jogen Chowdhury at *Chaarubasona* in Kolkata. His sora and cardboard paintings of Alpona are available in Kolkata for sale.

Contact # 9800410846

Sudipta Choudhry

Karma, oil on canvas

The Indian artist Sudipta Choudhry has been painting for over thirty years. She has had several exhibitions in prestigious venues in New York City, Los Angeles, Basel, London, Paris, Vienna, and Berlin.

Living in the Middle East, she is fascinated by the clarity of the desert light and likes to break it up into the splendors of its colors. She has evolved into creating abstract themes and is influenced by the Abstract Expressionist style.

Sudipta Choudhry

Phoenix of the Mind, oil on canvas

হৃদমাঝারে

পায়েল চট্টোপাধ্যায়

বারবার লেখাটা কাটাকুটি করছে মণিমা। গল্পটা সাজাতেই পারছে না। আজ রাতেই সম্পাদককে জমা দিতে হবে। সব মিলিয়ে ঘেঁটে যাওয়া অবস্থা। এই সময়ে যার নামটা বারবার মনে আসছে ফোনটা খুলে একবার তার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসটায় চোখ বোলায় মণিমা। শূন্য মাঠ। লাল মাটি। ছবিগুলো শান্তিনিকেতনের। আজ নিশ্চয়ই আবার গেছে সৌম্য। পুরনো ছবি দিচ্ছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। এই একটা জায়গা সবটা এলোমেলো করে দিল মণিমার।

-"মণি, শান্তিনিকেতন শুধু একটা শহর বা একটা ঘোরার জায়গা নয় আমার কাছে। আমি আমার জন্মদিনটা ওখানেই কাটাতে চাই।"

-"সৌম্যদা, এ বছরটা কি বাদ দেওয়া যায় না? আমি কোনদিন জানতেও চাইনি প্রতি বছর জন্মদিনে কেন তুমি শান্তিনিকেতন গিয়ে ওই হোটেলটাতেই জন্মদিনের খাবার খাও! প্রতি বছর আমি তোমার সঙ্গ দিয়েছি। মা এই প্রথমবার তোমায় নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে চাইছে। সেটাও তোমার জন্মদিনে। এটুকু কথা রাখতে পারছো না?”

-" সম্ভব নয় মণি।"

-"এত জেদ তোমার! কী আছে ওই ছোট্ট খাবার দোকানটাতে? প্রতিবছর তোমায় জন্মদিনের ভাত ওখানেই খেতে হবে! তুমি নিজেই বলেছ তোমার মাকে তুমি পাওনি, ছোটবেলায় বাবা চলে গেছেন। আমার বাবা-মা তোমায় আপন করে নিতে চাইছেন। তুমি ওদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছো কেন? শান্তিনিকেতনের ওই ছোট্ট খাবার দোকানটার প্রতি কিসের এত পিছুটান তোমার?”

সৌম্য আর উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছিল সেদিন। দিন পনের কেটে গেছে। অভিমানী মনিমা সৌম্যর ফোনের উত্তর দেয়নি। যথারীতি ওপ্রান্ত থেকেও নিস্তব্ধতা এসেছে।

আজ সৌম্যর জন্মদিন।

সৌম্য, মণিমা দুজনেই সাহিত্যর ছাত্র-ছাত্রী। লেখালেখি করে। একটা পত্রিকার অনুষ্ঠানে আলাপটা গাঢ় হয়েছিল। সৌম্য সদ্য চাকরি পেয়েছে স্কুলে। আলাপ থেকে প্রেম পর্যন্ত সম্পর্কটা গড়াতে খুব বেশি সময় নেয়নি। বিয়েও প্রায় ঠিকঠাক। মাঝখানে অভিমানের দমকা স্রোত সবটা এলোমেলো করে দিয়েছে।

গল্প জমা দিতে হবে কাল সম্পাদককে। বিক্ষিপ্ত মনে মনিমা কিছুতেই শব্দ সাজাতে পারছে না। কোন সময় এমন কিছু হলে সৌম্যর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলা ম্যাজিকের মত কাজ করে। আজ সবটা বিস্বাদ ঠেকছে মণিমার।

-"মণি দ্যাখ টিভিতে কী দেখাচ্ছে?"

মায়ের ডাকে চমক ভাঙে মনিমার। সাদা কাগজ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করেনা। মা আবার ডাকে। অবশেষে টিভির ঘরে উঠে যায় মনিমা।

একটা জমাটবাঁধা কুয়াশার চাদর সরে যায়।

এক পাচার হয়ে যাওয়া মহিলার কাহিনী নিয়ে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে টিভি চ্যানেলে। দীর্ঘদিন একটা অন্ধকার জায়গায় কাটানোর পর মহিলাটিকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উদ্ধার করেছিল। তারপর তাদের সাহায্যে মহিলাটি শান্তিনিকেতনের একটি হোটেলে রান্নার কাজ পায়। কিন্তু স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিল সে। সেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তখন মহিলাটির ছেলে স্কুল শিক্ষক সৌম্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ছেলেকে চিনতে না পারলেও ছেলে নিয়মিত মায়ের চিকিৎসা করাত। তবে শান্তিনিকেতনের নির্দিষ্ট হোটেলটিতেই রান্নার কাজ করতেন মহিলাটি। ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দেয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থা এবং ছেলের সাহায্যে মহিলাটি অবশেষে স্মৃতি ফিরে পেয়েছে।

টিভি চ্যানেলে সৌম্য আর বৃষ্টির মত চোখ ওলা এক মহিলার সাক্ষাৎকার দেখাচ্ছে। মনিমার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। সাক্ষাৎকারটা যেখানে দেখাচ্ছে তার পাশেই সেই বনবীথি হোটেল। এখানে সৌম্যর মা দীর্ঘদিন থেকেছে আর এখানেই জন্মদিনে সৌম্য ভাত খেতে যেত। মণিমাও সঙ্গ দিয়েছে কতবার। শুধু সৌম্যর ভেতরের ঝড়টা বোঝেনি। মনিমার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। অভিমানের মেঘ কেটে আলো দেখা দেয়।

মণিমা দৌড়ে নিজের ঘরে যায়। এখন বেরোলে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসটা ধরতে পারবে হয়তো। মনিমা সঙ্গে গল্পের খাতাটা নিয়ে নেয়। ট্রেনে বসে শেষ করবে। তারপর বিকেলে ফেরার পথে সৌম্যকে একবার দেখিয়ে নেবে। সকালের মিঠে রোদ মণিমার মুখে পড়ে চিক-চিক করে।

পায়েল চট্টোপাধ্যায়

আকাশবাণী কলকাতার ট্রান্সমিশন এক্সিকিউটিভ। অক্ষরের সঙ্গে আত্মার টান। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত। প্রথম প্রকাশিত নিবন্ধ সংকলন *রাজবাড়ির ইতিকথা।*

এক ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজো (সংগৃহীত)

দিলীপ হরি

সুইডেনের শেষ প্রান্তের একটি ছোট্ট শহর সীটন। ছোট্ট মানে একেবারেই ছোট্ট। যাকে হ্যামলেট বলে সেই ধরণের। জনসংখ্যা মাত্র আটষট্টি। তার অধিকাংশই আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধা। তাঁরা জনপদটিকে সন্তানের মত স্নেহ করেই যেন এখানে রয়ে গেছেন। এমনিতে তো বরফে সবকিছু জমে থাকে বছরের চার চারটি মাস। তবু ওই বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ থেকে আসা উষ্ণ স্রোত যা একটু উত্তাপ দেয় ওই বৃদ্ধ মানুষকটির হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

জনসংখ্যায় নগণ্য হলেও শুধু খ্রীষ্টান নয়, মুসলমান, ইহুদিরাও আছেন। আর আছেন একজন হিন্দু। তাঁরা সবাই সুইডিশ নাগরিক হলেও আপনাপন ধর্মাচারণে এই শহরের মানুষ কখনও কাউকে বাধা দেন নি। একে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন অপরকে। সবাই মিলে তৈরি করেছেন এক আদর্শ সমাজ।

এই সমাজের প্রাণভোমরা এক দম্পতি। আবেল রনবার্গ আর তাঁর স্ত্রী রীনা। আবেল জন্মসূত্রে ইহুদি আর রীনা ভারতীয় এবং বাঙালি। ওঁরা দুজনেই জার্মানির হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। ফিজিক্স আর ভারতীয় ইতিহাসের প্রেম আর পরিণয়ও সেখানেই। বেশীদিন জার্মানিতে ভালো না লাগায় তাঁরা স্টকহোম চলে আসেন। সেখান থেকে এই মুল্লুকে। দুজনেই সত্তরোর্ধ হলেও প্রাণস্পন্দনে ভরপুর। সব ধর্মের আনন্দ অনুষ্ঠানে তাঁরা সক্রিয় সহযোগিতা করেন। হ্যাঁ, ছোট্ট করে করেন একটা দুর্গাপুজোও।

রীণা চ্যাটার্জী হুগলির মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের শরিকি বাড়িতে দুর্গাপুজো হতে দেখে এসেছেন। তাই দুর্গাপুজোর সঙ্গে তাঁর আত্মিক টানটুকু রয়ে গেছে আজ অবধি। তারপর কলকাতা, দিল্লী, লন্ডন, হামবুর্গ.. যেখানেই থেকেছেন, পুজোর সময়টুকু চিরকাল মায়ের পায়েই নিবেদন করেছেন। তাছাড়া তিনি সংস্কৃতে সুপন্ডিত ছিলেন বলে পুজোর মন্ত্রপাঠ ও পদ্ধতি নিয়েও ভাবতে হয় নি কোনোদিন।

সীটন এর পুজো গতবছর অবধি বেশ সাড়ম্বরেই হতো। তবে দুদিন। ওই অষ্টমী আর নবমী। রান্না হতো পায়েস। দুর্গার পটচিত্র ছিল রীণার বাড়িতে। সেখানেই পুজো হতো ফুল ফলাদি সহযোগে। রীণা মন্ত্র পড়ে সকলকে টীকা পরিয়ে শান্তির জল দিতেন। গঙ্গা তো নেই, তাই সমুদ্রের জলের সঙ্গে জর্ডনের হোলি ওয়াটার মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতেন সবার মাথায়। কারো শান্তির অভাব ছিলো না।

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ যখন রীণাকে কেড়ে নিল, তখন স্বামী আবেলের মতই পুরো সীটন শহরটাই সাময়িক স্বব্ধ হয়ে গিয়েছিল শোকে। সেটা জুলাই মাস। মাস্ কনডোলেন্স হয়েছিল স্থানীয় চার্চে। সেখানে তখন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। রীণার সবচেয়ে ভালোবাসার ছিল যে দুর্গাপুজো, তা চালিয়ে যেতে হবে। সীটনের সবাই মিলে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর সেটাই হবে সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি। রীণার আত্মা নিশ্চয়ই তাতে শান্তি পাবে।

অনলাইনে পুজোর তারিখ খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না। ঠিক হলো স্থানীয় চার্চের এনেক্সে একটা ঘর পুজোর জন্যে খুলে দেওয়া হবে। ফুল আর ফলের অভাব নেই। পায়েস রান্না দেখে দেখে শিখে নিয়েছেন অনেকেই। তবু চাল নয় ওটসের পায়েস হবে ঠিক হলো। কারণ চাল সিদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নেই কারোরই।

সমস্যা হল পুজোর মন্ত্রপাঠ নিয়ে। সংস্কৃত দূর অস্ত, ইংরেজি জানা নেই প্রায় কারও। সুতরাং অষ্টমীতে রীণার ইহুদী স্বামী আবেল আর নবমীতে এক প্রবীন পাঠান ইউসুফ আজমের ওপর দায়িত্ব পড়লো মন্ত্র পড়ার। মুলতানে ইউসুফের বাড়ির পাশেই একটা শিবমন্দির ছিল। তিনি জানেন কি ভাবে মন্ত্র পড়তে হয়। তিনি সানন্দে রাজি হলেন।

পুজো হয়ে গেলো। এবারের পুজো যেন একটু অন্যরকম! সে হোক! তবু বড়ই আন্তরিক। কান্ডারি নেই বটে। কিন্তু তাতে কি? পরিবার তো আছে! মানুষের পরিবার। আত্মীয়তার বাঁধন সেথায় নাই থাক, মানবিকতার দৃঢ় এক বন্ধন আছে! আর আছে পারস্পরিক সম্মান, আবেগ, ভালোবাসা। মা দুর্গাও তো মানবী।মন্ত্রতন্ত্র নয়, সহজ সরল 'মা' ডাকে কি তিনি কাছে আসেন না? তবে তিনি কেমন মা?

বোধহয় সত্যি আসেন। মায়াবী চোখ দুখানি তুলে তাকান। আশীর্বাদ করেন। কোভিডে রীণা মারা যাওয়ার পর আর কেউ আক্রান্ত হননি সীটনে। বৃদ্ধ মানুষ ক'টির সহজ সরল জীবনযাত্রা আগের মতই শিথিল শ্লথ গতিতে আজও চলছে। রীণার বাড়ির বৈঠকখানায় পটের দুর্গা আগের মতই স্মিত হাসিমুখে বিরাজ করছেন। তাঁর পুজো সামনের বছরেও হবে একথা তিনি জানেন। তিনি যে অন্তর্যামী!

(বসিরহাট হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের কথোপকথন ও অন্যান্য সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত)

দিলীপ হরি একজন CPA এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ,কর্নেল স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করেছেন। একটি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি DPNY হসপিটালিটির মালিক এবং চারটি ভিন্ন রাজ্যে হিলটন, শেরাটন এবং বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল পরিচালনা করেন। ওয়েবসাইটটি হল www.dpnyhospitality.com। দিলীপ ম্যানহাটন, এনওয়াইতে ৭টি এবং ওয়াশিংটন ডিসি-তে একটি ফ্রেঞ্চ ওয়াইন বিস্ট্রোর মালিক। ওয়েবসাইটটি হল www.vinsurvingt.com।

চৈতালি সরকার

সাঁকো

অনেকদিন পর আজ কলেজে এল দীপিকা। আজকের দিনটা স্পেশাল। সুপ্রীতি বলছিল বাংলার নতুন স্যার জয়েন করেছেন। প্রথম ক্লাসেই ফাটাফাটি মজা করা যাবে। দীপিকা কিছুতেই মিস করতে চায়না। তাই অসুস্থ শরীরেও হাজির হয়েছে কলেজে।

বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, নামটার মধ্যেই কেমন আগুন আছে। চেহারাও বেশ সুন্দর। যেমন গায়ের রং, তেমনি হাইট। প্রায় ছফুটের কাছে হবে।বয়স কতইবা, বড়জোর সাতাশ-আঠাশ। এককথায় সুপুরুষ বলা যায়।

থার্ড ইয়ারের মেয়েরা অধিকাংশই সেজেগুজে এসেছে। প্রথম দিন নজর কাড়তে কে না চায়! দীপিকার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। এমনিতেই ওর গায়ের রং বেশ কালো। তারপর কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছে, জৌলুস বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে টিকালো নাকের দুপাশে চোখদুটো এখনো উজ্জ্বল। কত না বলা কথা যেন লেখা আছে ঐ চোখে।

চেয়ারে আঠা লাগানো, টেবিলের তলায় মার্বেল রেখে দেওয়া, কিংবা বোকা বোকা প্রশ্নে বেকুব বানানোর দিন শেষ। তাহলে কি করা যায়? দুষ্ট ছেলেদের মাথা থেকেও কিছু বেরোচ্ছে না। এদিকে স্যার আসার সময় হয়ে গেল, অভিনব কিছু একটা তো করা চাই!

সুজাতা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "এসেছে, একটা প্ল্যান এসেছে।" সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল স্যারকে ঠকানোর কৌশল জানতে।

সুজাতা বলল, " ব্যাপারটা একদিনে মিটিয়ে নিলে চলবে না। আর প্রথম দিন শুরুও করা যাবে না।"

সবাই আশাহত হল। এ আবার কিরকম কথা! রঙ্গন বলল," প্রথম দিন মজা করার মধ্যে একটা অন্যরকম আনন্দ থাকে। তা নয় ....."। কথাটা কেড়ে নিয়ে সুজাতার উত্তর , " পুরো প্ল্যানটা আগে

শোন, তারপর যা ভালো বুঝিস করবি।"

প্রথম ক্লাসেই বাজীমাৎ করলেন বিদ্যুৎবাবু। শুধু পড়ানো নয়, আপন করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষটার। বিশেষ করে মেয়েরা তো একদম ফিদা।

দীপিকা সেকেন্ড বেঞ্চের একপাশে বসে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। স্যার পড়াতে পড়াতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্র তুলে ধরছেন। কখন যেন অরক্ষণীয়ার কালো মেয়েটির কথা উঠে এল। দীপিকা সোজাসুজি তাকাতে পারছে না স্যারের দিকে। উনি কি সুজাতার দিকে তাকিয়ে আছেন? এই ক্লাসে ওর মতো কালো কেউ নেই। অসুন্দরের উপমা দিতে গিয়ে একবার কি ওর দিকে স্যারের চোখ পড়বে না! সঙ্কোচ আর আত্মগ্লানিতে ওর মাথা নিচু হয়ে গেল।

পড়ানোর শেষে স্যার বই গুটিয়ে দেখলেন একটা মুখখোলা খাম টেবিলে পড়ে আছে। উনি কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

দরজা পেরোতেই রঙ্গন পেছন পেছন ছুটল।" স্যার " বলে ডাকতেই বিদ্যুৎবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, " তুমি আমাকে ডাকছ?"

রঙ্গন হাতের খাম দেখিয়ে বলল," এটা আপনার স্যার। ওপরে আপনার নাম লেখা আছে।" বিদ্যুৎবাবু কোনো বাক্য ব্যয় না করে খামটা নিয়ে নিলেন।

পরের দিন সবাই অপেক্ষা করছে স্যারের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। সুজাতা বলল," স্যার নিশ্চয় মেয়েটাকে খুঁজবে।" সোনালী বলল," আচ্ছা এমনতো হতে পারে স্যার বিবাহিত কিংবা অ্যাফেয়ার আছে।" সুজাতা জোরের সাথে বলল," আমি নিশ্চিত স্যার আমাদের ফাঁদে পা দেবেন। "

দীপিকা হতাশার সুরে বলল," ব্যাপারটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। আমার কেমন ভয় করছে।"

কথোপকথনের মাঝেই স্যার এসে গেছেন। আশ্চর্য

বিদ্যুৎবাবু একদম স্বাভাবিক গলায় পড়িয়ে যাচ্ছেন। কালকের চিঠি বিষয়ে একটা কথাও বললেন না। তাতে কি হয়েছে? সুজাতা তো বলেছিল একদিনে হবে না। ওরাও রেডি করে রেখেছে আট - দশটা চিঠি। এক লাইনের চিঠিতে আছে, " স্যার, আমি আপনাকে ভালোবাসি।" প্রেরকের নাম লেখা নেই। স্যার আবেগে তাড়িত হয়ে মেয়েটিকে খুঁজবেন, এখানেই মজা।

বিদ্যুৎবাবুও অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। দিনের পর দিন

চিঠি পান। কখনো সজল, কখনো তানিয়া খাম নিয়ে ছোটে। স্যার সুবোধ বালকের মতো চিঠি নিয়ে নেন। কোনো প্রত্যুত্তর নেই, কোনো নালিশ নেই। এমনকি চেহারায় কোনো কৌতূহলের ছাপও ফুটে ওঠেনা। সকালে চা খাওয়ার মতো এটা যেন একটা অভ্যাস।

ছেলেমেয়েরা একদিন বিরক্ত হয়ে উঠল। পনেরো দিনে স্যারও পুরনো হয়ে উঠেছেন। সেই পাগলামিগুলো আর ওদের নাড়া দেয়না।

একদিন সবাইকে অবাক করে স্যার বললেন, " কি তোমাদের চিঠি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল? " সবাই সলজ্জ দৃষ্টিতে মাথা নিচু করে নিল। স্যার বললেন, "এবার বলতো মেয়েটা কে? মানে লেখাটা কার? "

সুজাতা হাসি হাসি মুখে বলল," প্ল্যানটা আমার হলেও লেখাটা কিন্তু দীপিকার। " বেঞ্চের একপ্রান্তে বসে দীপিকা মুখ লুকানোর চেষ্টা করছে। বন্ধুদের কথায় কাজটা করতে হয়েছে কিন্তু ও তো আড়ালেই থাকতে চেয়েছে। অসুন্দরের উপমা ও, কিভাবে নিজেকে স্যারের সামনে প্রকাশ করবে ?

বিদ্যুৎবাবু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "হাতের লেখাটা খুব সুন্দর। "

কিছুদিনের মধ্যেই কলেজে অ্যানুয়াল ফাংশন। সবাই রিহার্সালে ব্যস্ত। একপাশে দাঁড়িয়ে দীপিকা তন্ময় হয়ে দেখছে। হঠাৎ বিদ্যুৎবাবু কাছে এসে বললেন, " তুমি একা দাঁড়িয়ে কি করছ? " চমকে উঠল দীপিকা। বুকের কাছে দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে তরঙ্গ। কথার কোনো জোগান পেলনা । শুধু মুখে ফ্যাকাসে হাসি।

স্যার আরও কাছে এসে বললেন," প্রতিদিন তুমি আমাকে চিঠি দিয়েছ। আমি অপেক্ষা করেছি। কাউকে বলিনি।"

দীপিকার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। কেইবা মনের খবর রাখে! চিঠি লিখতে লিখতে কখন যে অঙ্কুরিত হল, কখন সম্পূর্ণ হৃদয় দখল করল..... কেইবা খবর রাখে! ও জানে এটা অসম্ভব, তবু নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারছে কই!

একদল ছেলেমেয়ে তখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। অনুষ্ঠানের কলাকুশলী সব। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল সজল, তানিয়া। কেউ লক্ষ্য করল না দুজন মানুষের নিবিড় আলাপন।

তরঙ্গ দুলিছে হিয়ার মাঝে, কে রুধিবে তারে ..!

স্যার আরও আরও কাছে এসে বললেন," তুমি বোঝোনি, এই চিঠির মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে একটা সাঁকো তৈরি হয়েছে। তুমি চাইলেও তা ভেঙে দিতে পারবেনা।"

ঠিক সেইসময়ই কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল!

চৈতালি সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.A. পূর্ব বর্ধমানের অন্তর্গত বিল্বেশ্বর বিনোদীলাল বালিকা বিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষিকা।

ভালো আছেন

সাধন কুমার পাত্র

ভালো আছেন ? ভালো আছি। খুব ভালো আছি, বাবা। আসলে তোমার কাকিমা বলল, আজ একটু ইলিশ নিয়ে এসো দেখি। আমিও ভাবলাম, এবছর একদিনও ইলিশ খাওয়া হয়নি। তাই দৌড়ে বাজারে এলাম। তুমি শৈলেন। দেখ বাবা, ঠিক চিনতে পেরেছি। একসময় তোমরা কত যেতে বাড়িতে। এখন শঙ্খও নেই, তোমরাও আর যাও না। তা শঙ্খের সঙ্গে কথাবার্তা হয় তো না কি।

কে শৈলেন ? আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন ? কেন শৈলেনের সঙ্গে। শৈলেন খুব ভালো ছেলে। দেখুন, এখানে কেউ নেই। তবে যে ভালো আছেন বলল। ও আচ্ছা, বুঝেছি। হাতে সময় নেই বলে চলে গেছে। সবাই এখন খুব ব্যস্ত। ভালো আছেন জিজ্ঞাসা করা কি তবে সৌজন্য হয়ে গেল। উত্তর শোনার সময় নেই কারও। কত কিছুই তো দেখছি দিনে দিনে। তা যাক, যাই, বাড়ি যাই। ওদিকে আবার দেরি হয়ে গেলে মুস্কিল। গিন্নী সারাদিন শুধু পায়রার মত বাকুম বাকুম করবে।

কি গো, পুরো সকাল তো ইলিশের ভেল্কি দেখিয়েই মেরে দিলে। বলছি, কাজের মাসি আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। এক কাজ কর, মাছটা আজ তুমিই কর দেখি। আর উপরে ওগুলো ভিজিয়ে দিয়েছি, একটু ধুয়ে মেলে দিও। এই মাসিকে নিয়ে আর পারি না। রোজ রোজ কামাই করবে, আবার পরের দিন এসে দাঁত বার করে মিথ্যা কথা বলবে। পারেও বাবা। আজ বরের তো কাল ছেলের, কবে আবার নিজের। শরীর খারাপ লেগেই আছে। আর যদি পারো একবার ঝাঁট দিয়ে দিও। আজ আর মোছার দরকার নেই। সবসময় শুধু খবর আর খবর। এতো খবর দেখে কি হয় বলতো। কেউ গোলাপ ছুঁড়ছে। কেউ হুঙ্কার দিচ্ছে। আজ এদল তো কাল অন্যদল। এদের কোন মান-সম্মান আছে বলে তো মনে হয় না। কে, কি খাচ্ছে। কে, কি করছে। কে কার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাচ্ছে। এই নিয়েই রাতদিন পড়ে আছে। আর তুমি বুড়ো, এই বয়সে এসে বসে বসে ভেল্কি দেখছো।

পৃথিবীর সবাই ঐ এক জায়গায় জব্দ। যত বড় রাঘববোয়াল হোক না কেন, ওখানে ট্যাঁ-ফুঁ করলেই বিপদ। এই বিপিনবাবু ছিলেন পুলিশের একজন দুঁদে অফিসার। যার কথায় একসময় বাঘে-বলদে একঘাটে জল খেত। কত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা স্যার স্যার করে ভজন গাইত। এখন কেউ নেই। ছেলেবৌমা বাইরে থাকে।এক মেয়ে। বিয়ের পর সেও এখন পরের ঘরে, থাকার বলতে আজীবন হাপাতুড়ি খেয়ে করা কিছু সম্পত্তি আছে। আর এই সুলক্ষণা গিন্নী। অবসরের আগেই সুগার ধরেছিল। এখন আবার প্রেশারটা আপ অ্যান্ড ডাউন করে। আর প্রোস্টেটের একটা চিন-চিনানি ব্যথা। যার ফলে দুবেলা ঔষধ এখন খাদ্যের মত হয়ে উঠেছে।

পূজোর সময় হয়ে এল। ছেলে বৌমা নাতি আসবে। দুজনের খুব ব্যস্ততা। মেয়ের আসা হচ্ছে না, ওরা বিদেশ ভ্রমণে যাবে। ওগো শুনছো, এবার আস্তে আস্তে কেনাকাটা শুরু করে দাও। অনেক জিনিস লাগবে। নাতিসাহেব যেগুলো খেতে ভালোবাসে সব বানাবো কিন্তু। সময় করে খাটালে একবার দুধের কথাটা বলে রাখবে। আর নান্টুর মাকে বলে রেখেছি, নারকেলগুলো নিয়ে আসবে। বিপিনবাবু বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে বেরোলেন। শোন শোন, এদিকে এসো একবার। আরে বলো না। সব কথা কি চেঁচিয়ে বলা যায় নাকি। দশের বাণ্ডিল নেবে, আর দুটো পঞ্চাশের আর একশোর। বড় নোট হলে খুব সমস্যা হয় বাবা। তাড়াতাড়ি আসবে। ব্যাঙ্কে খুব ভিড় ইত্যাদি ফন্দি ফিকির সাজিয়ে আড্ডায় বসে যেওনা আবার।

দিনে দিনে নারকেল নাড়ু, মণ্ডা, খই, মুড়কি ইত্যাদি তৈরি হল। বয়স হলেও বিপিনবাবুর লোভ একেবারে বাচ্চা ছেলের মত।ধিকিধিকি রেলগাড়ির মত মুখ চলছেই। দু-একদিন দেখে, তুমিই যদি সব খেয়ে নাও, তবে আর নাতিসাহেব কি খাবে। তাছাড়া তোমার তো মিষ্টি খাওয়া বারণ। শরীর খারাপ হলে, তখন সেই আমাকেই দেখতে হবে। সেদিন পই পই করে বললাম, শুনলে না। তারপর এসে তিন-চার দিন পড়ে দিলে। ডাক্তার, ওষুধ, কত কি কাণ্ড ঘটে গেল। খাসি মাংসের প্রতি বিপিনবাবুর টান চিরকালের। এখন বোকা খাওয়ার ভয়ে খাসির খ-ও আর ঢোকে না বাড়িতে। কিন্তু অনুষ্ঠান বাড়িতে গেলে মনটা সবসময় খাসি খাসি হয়। এক পিসও খাবো না এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েও প্রেমে পড়ে দু-চার পিস খেয়ে ফেলেন। আর তারপরই বদহজম, কোষ্ঠ-কাঠিন্য যত বিপত্তি শুরু হয়। সুলোচনাদেবী সেটাই মনে করিয়ে দিলেন।

পূজোর সময় বউ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রমেশ বাড়ি এল। দাদু-নাতির খুব ভাব। ক্ষুদে যেন সারা বছর অপেক্ষায় থাকে, কবে দাদুর সাথে দেখা হবে। সারা দিন খেলাধুলা, বাগানের গাছ চেনানো, ডালে বসা পাখিদের নাম জানানো, সামনের রাস্তায় ঘোরাফেরা, আর রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প বলা। সাত-আট দিন ভালোই কাটে দুজনের। তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াটাও দারুণ জমে। ছেলের সাথে বেশি কথা না হলেও বৌমার সাথে অনর্গল চলে। সম্পর্ক একেবারে পিতা-পুত্রীর মত। সন্ধ্যার দিকে লিকার চা করে বৌমার হাতে ধরিয়ে দিলেন শ্বশুরমশাই। ইতস্তত: করলেও দুজনে বসে বসে বিভিন্ন গল্প জমে উঠল। চাকরি জীবনের গল্প, জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকার গল্প। কখনো কখনো ভূত-প্রেতের উড়ো গল্পও খুব ভালো লাগে তার। বৌমা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। পূর্ববঙ্গের মেয়ে ছিল। ছেলে তাকে পশ্চিমবঙ্গের করে নিয়েছে। বড় মিষ্টি মেয়ে। এই কদিন যতটুকু পারে শাশুড়িকেও সাহায্য করে চলে। কাজগুলোকে শিখে নেওয়ার চেষ্টা করে সবসময়।

শীত আস্তে আস্তে জাঁকিয়ে বসছে এবার। নৈশভোজের আগে সকলে এক জায়গায় শাশুড়িকেও সামনে। বাবা, বলছি এবার তোমরা আমাদের সঙ্গে চলে চল। বয়স হচ্ছে। আর টানতে পারবে না। একসাথে থাকলে সময়টাও ভালো কাটবে। তাছাড়া শাশুড়িকেও তোমাদের পেয়ে খুব আনন্দে থাকবে। বৌমাও ছেলের সঙ্গে সঙ্গে পীড়াপীড়ি শুরু করল। মন্দ হয় না। কিন্তু এতো বড় বাড়িটা ছেড়ে যাই কি করে। এর সঙ্গে যে আমার আজন্মের সম্পর্ক। এই বাড়ির কোণায় কোণায় কত স্মৃতি। তাছাড়া ঐ জেলখানার মতো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকাও আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হবে। আমি চিরকালই ভবঘুরে মানুষ। এখনও প্রতিদিন বিকেলে তোর নরেণ কাকা, মাস্টারদা, বিবেকদের সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক জমিয়ে আড্ডা দিই। ওখানে গেলে এসব তো আর পাওয়া যাবে না, বাবা। তাই যতদিন সচল আছি, এখানেই থাকি।কিছু মনে করো না বৌমা।পারলে তোমরা বরঞ্চ মাঝে মাঝে চলে এসো। মিতভাষী ছেলেও অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করল।

সুসময় দুঃসময়কে নিয়েই সময় নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলে। দিনের ব্যবধানে বার্ধক্যজনিত অসুখ ঘিরে ধরতে চাইছে এবার। সুলোচনাদেবী এখন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বিপিনবাবুর চোখের সমস্যা বহুদিনের। ইদানীং হাঁটাচলায় শৈথিল্য আসছে। হাতে অতিরিক্ত একটা লাঠি এসে জুটেছে। কিন্তু মন ফুরফুরে সবসময়। বর্তমানের যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হয় না তার। সামনে পিছনের আধুনিক অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েও বুদ্ধির প্রখরতায় সমাজের পরিবর্তন খুঁজতে থাকেন। বেমালুম মিথ্যা বলা ওস্তাদকে দেখেও ভাবেন, এখন মিথ্যা বলবে না তো কখন বলবে। কোন কিছুকেই তিনি এখন মন্দ বলে ভাবেন না। সব ঠিক, সবই ভালো। কিন্তু একদিন সব ভালোর মাঝেও কষ্ট নেমে এল।

আচমকা বুকে ব্যথা শুরু হল সুলোচনাদেবীর। সময় না দিয়ে, সকলকে ফেলে রেখে চলে গেলেন চির ঘুমের দেশে। এইভাবে নিঃশব্দে চলে যাওয়া বড় অদ্ভুত মনে হল বিপিনবাবুর। একদিনের জন্যও কারও সেবা না নিয়ে, আজীবন শুধু সেবা দিয়েই চলে গেল। চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ দুটির দিকে চেয়ে বসে পড়লেন অশীতিপর বৃদ্ধ। সারা রাত শেষে সকাল জুড়ে বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের অজস্র স্মৃতি ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল। সবকিছু থেকেও এই প্রথম একাকীত্বের অনুভব

হল তার। পুত্র কন্যা সব থেকেও আজ কেউ নেই। এবং পাড়া প্রতিবেশী কত আপন হয়ে উঠতে পারে নিজের চোখে দেখতে লাগলেন। ছেলে মেয়ের আসতে আসতে দিন গড়িয়ে বিকেল এসে পৌঁছল।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মত পারলৌকিক ক্রিয়ার দিনগুলিও শেষ হয়ে এল। বিপিনবাবু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠোন থেকে উদাসীন ভাবে চেয়ে আছেন পূবের আমগাছটির দিকে। গাছটির প্রতি সুগভীর যত্ন ছিল সুলোচনার। এখন শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে কত বড় হয়ে উঠেছে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কত পাখি ভালোবাসার ঘর বেঁধে আছে। একটা উড়ে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে এসে বাচ্চাগুলোর মুখে মুখে খাবার গুঁজে দিচ্ছে। সুলোচনা এই দৃশ্য দেখলে কতই না খুশি হত।

ঠিক এরকম সময়ে পিকু এসে হাত ধরল দাদুর। নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। বাবা, তুমি রেডি হয়ে নাও। এবার, আমরা আর তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। ঘরের কোণে, টেবিলের উপর ধূপ মালায় সজ্জিত সুলোচনার ছবিখানা সকরুণ দৃষ্টিতে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে আছে। সে যেন জানিয়ে দিচ্ছে, এক মুহূর্তও তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। যেন বলতে চাইছে, আর কেউ না থাকুক, আমি আছি।আমি তোমার খেয়াল রাখব বিপিনবাবু। এরূপ নানাবিধ চিন্তা মনে ভেসে ভেসে মিলিয়ে যেতে থাকল। ছেলের প্রশ্নের উত্তরে নির্বাক বিপিনবাবুর চোখ অবনত হয়ে রইল ভূমিতলের দিকে। অসংখ্য কথার দল কাছে কাছে এসেও অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যেতে থাকল বারবার।

ডঃ সাধন কুমার পাত্র। পেশায় অধ্যাপক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ., এম. ফিল., ও পিএইচ. ডি.। কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখা তার শখ। প্রকাশিত গ্রন্থ – ফুলমনি(উপন্যাস), কারক-প্রকরণ, কাব্যভেদবিমর্ষঃ ও সহজ অনুবাদ-শিক্ষক। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।

পশ্চিমের বাড়িতে কিছুক্ষণ

অঙ্কুর ঘোষ

কল্পময় এই প্রথম এসেছে মণিকান্তপুরে। বাবার সঙ্গে। তার বাবার খুব ইচ্ছে, ছেলে তাঁর পৈতৃক ভিটে একবারটি চাক্ষুষ করুক। এতগুলো বছর কেটে গেছে, কল্পময়কে নিয়ে এসে ওঠাই হয়নি। এবছর গরমের ছুটিতে তিনি ঠিক করেই রেখেছিলেন, যে করে হোক কল্পময়কে সঙ্গে করে মণিকান্তপুর আসবেন।

কল্পময়ের কিন্তু জায়গাটা বেশ লাগছে। কেমন নির্জন, খোলামেলা সবুজ প্রান্তর, মাঠের পর মাঠ, খেতের পর খেত। চোখ জুড়িয়ে যায়। দুইধারে অজস্র বড়ো-বড়ো বৃক্ষ ছায়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বাড়িটাও অনেক পুরনো। একসময় মণিকান্তপুরের রাজবাড়ি ছিল। এখন অবশ্য যেমন রাজত্ব নেই, তেমনই বাড়িটারও ভারি জরাজীর্ণ দশা। শুধু একটা অংশ কোনোমতে আজও দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই বসবাস করেন কল্পময়ের ছোট কাকা আর কাকিমা। বাড়ির পশ্চিম দিকটা একেবারেই ভগ্নপ্রায়। শ্যাওলা আর আগাছায় দেওয়ালগুলিকে একেবারে গ্রাস করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে মস্ত-মস্ত স্তম্ভগুলির গায়েও চিড় ধরেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেকোনো দিন হয়তো তাসের মতো সব সুদ্ধ ভেঙে পড়বে।
কল্পময়কে প্রথম দিনই কাকিমা বলে দিয়েছিলেন, 'ওদিকটায় কক্ষনো যেও না যেন।'

'কেন কাকিমা? বাড়িটা ভেঙে পড়তে পারে বলে?'

'তা সে ভেঙে না পড়লেও তোমার বাবা-কাকা মিলে খুব শিগগির ভেঙে ফেলবেন।' কাকিমার স্বরে কোথাও যেন ক্ষীণ আনন্দের আভাস পেল কল্পময়। তিনি বোঝালেন, 'অবশ্য আমি সাপ-টাপের জন্য তোমায় যেতে বারণ করছি। ওদিকটা একদম পরিষ্কার করা হয় না যে। আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে।'

তাঁর কথা ঠিক। তবে, শুধু যে ওদিকটাই পরিষ্কার করা হয় না, তা তো নয়, মনে মনে ভাবল কল্পময়। কেন? আসার সময় যে বড়ো ঝিলটা পড়ে তার কথাই ধরা যাক না। যেখানে ছেলেবেলায় বাবা নাকি মাছ ধরতেন, বিছুটি পাতা আর কচুরিপানায় এখন কী চেহারা হয়েছে তার! তারপর, উঠোনটাই বা কী পরিষ্কার? দু-চারবার ঘষলে বোধহয় পুরু ধুলো হাতে উঠে আসবে। কাকিমা একদিন বলছিলেন, ওঁদের মালী এবং ঘর ঝাড়পোঁছ করার লোকটি- হারাধন আজকাল প্রায়ই কাজ ভুলে যায়। কী একটা কাণ্ড হওয়ার পর থেকে সে খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে বহুদিনের লোক। আবার তাকে ছাড়া চলবেও না।

আর ওই বাড়ি ভাঙার ব্যাপারটা? আসলে কল্পময়ের বাবা দেখতে গেলে সেই কারণেই এসেছেন। পশ্চিমের বাড়িটা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হবে। একজন প্রমোটারর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। কাছেই একটি কারখানা তৈরি হচ্ছে। তারাই কিনে নেবে জমিটা। প্রথমদিন ব্যাপারটা জেনে কেন জানি কল্পময়ের দুঃখ হয়েছিল। আহা, এতদিনের পুরোনো বাড়ি! কত স্মৃতি, কত ইতিহাস! সব হারিয়ে যাবে?

এখন দুপুর তিনটে। কল্পময় দুপুরে ঘুমোয় না। এখন সে বাগানে শ্বেত পাথরের শুকনো ঝরনাটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ এমন দাঁড়িয়ে আছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা শিস দেওয়ার শব্দে চমকে উঠল সে। কে দিল শিস? কোনো পাখি নয় তো? ওই যে জামরুল গাছের ডালে নীল রঙের কী সুন্দর একটা পাখি বসে আছে। কী নাম যেন?

একপা-একপা করে কল্পময় তার দিকে এগোতে চেষ্টা করল। ওই যা- ফুড়ুৎ! পাখিটা সোজা উড়ে গেল পশ্চিমের হানাবাড়ির দিকে। কল্পময় চাইল সেদিকে।

হঠাৎ তার মনের গভীরে প্রবল উন্মাদনার একটা স্রোত বয়ে গেল। কীসের এত উন্মাদনা? উত্তরটা সে জানে। পশ্চিমের বাড়িতে কী আছে, তা দেখার অদম্য কৌতূহলী কাজ করছে তার মনের ভিতর। এই অদম্য কৌতূহল তাকে বিভোর করে তুলেছে। বাড়ির ধ্বংসাবশেষগুলি তাঁকে বারেবারে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, একবার এসো- একবারটি এসো! কল্পময় ভাবল, সরেজমিনে ওদিকটা দেখে এলে মন্দ হয় না। কাকিমা, হারাধন সকলে এখন ঘুমোচ্ছে। কেউ কিছু জানতে পারবে না। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার।
দুরু-দুরু বুকে নিষিদ্ধ গণ্ডির দিকে পা বাড়াল কল্পময়। সত্যি, বড্ড বেশি কাঁটা ঝোপ এদিকটায়। হাঁটতে গেলে পায়ে বিঁধছে। হাত দিয়ে বুনো ঝোপঝাড় সরাতে সরাতে হেঁটে চলল সে।

অবশেষে বাড়ির রোয়াকটা দেখতে পাওয়া গেল। তার উপর প্রবল আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কল্পময়। সারা বাড়িটায় সে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। বেশি কিছু দেখার অবশ্য নেই। জানলার গায়ে মর্চে ধরা গরাদগুলি ঘরের ভিতরটা আড়াল করে রেখেছে। কল্পময় ভাবছিল, একবার সামনের জানলাটার পাল্লা দুটো নাড়াচাড়া করে, ভিতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবে কিনা। তাই সে করত বোধহয়, যদি না এমন অভাবনীয় একটা কাণ্ড ঘটত। কোথা থেকে কে জানে, তারস্বরে কে যেন হঠাৎ কল্পময়ের উদ্দ্যেশ্যে চিৎকার করে উঠল, 'জানলা খুলো না! খুলো না!' কল্পময় হুমড়ি খেয়ে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল! পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, তারই বয়সী একটা লিকলিকে রোগা ছেলে রোয়াকের সামনে দাঁড়িয়ে। 'দেখ দিকি, পড়ে যাবে যে! খুব চমকে দিলাম নাকি!'

কল্পময়ের রাগই হল। ঝাঁঝাল স্বরে সে বলে ওঠে, 'হঠাৎ করে অমন চিৎকার করলে কে না ভয় পায়!'

রোগা ছেলেটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'ওই ঘরটার ভিতর যত রাজ্যের চামচিকের বাসা, তাই তোমায় সাবধান করছিলাম। আমি কি আর জানি তুমি এমন ভয় পাবে!'

'তা, তুমি কে? এখানে কী করছ?' জানতে চায় কল্পময়।

'আমিও তো তাই তোমায় জিজ্ঞেস করতে চাই। কে তুমি?'

'আমি কল্পময়। আমার কাকা-কাকি থাকেন এখানে। মানে, ঠিক এইখানে নয়, ওই বাড়িটায়।' আঙুল দেখিয়ে বোঝায়।

'আমি ফটিক। এখানে একটু শান্তিতে বসে পড়ছিলাম। এমন সময় পাতার খসখস আওয়াজ শুনে দেখতে এলাম হঠাৎ কী ব্যাপার। প্রথমে ভেবেছিলাম সাপ-টাপ। বুঝতেই পারছ, সচরাচর কেউ এদিকটায় খুব একটা আসে না। তার উপর আমার আবার খুব সাপের ভয়!'

'তুমি এখানে বসে পড়ছিলে?' বিস্ময়ে চোখ কপালে কল্পময়ের।

'হ্যাঁ, এটাই তো আমার পড়ার জায়গা। ওই যে একদম ছাদের উপর চিলেকোঠার ঘরটা দেখছ? কী নিরিবিলি, বলো? এর চেয়ে শান্তি কোথায় আর পাব?'

‘তোমার ভয় করে না এখানে একা থাকতে?’

‘কীসের ভয়? তা হ্যাঁ, আমার শুধু- ওই যে বললাম, সাপের ভয়। তা, এতদিনে অবশ্য আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। সাপ কামড়ালে বড্ড ব্যথা হয়, জানো?’
‘তুমি সন্ধের পরেও এখানে থাকবে?’ কল্পময়ের কৌতূহল বেড়েই চলে।

‘দেখি আজ কী করি...,’ হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ল ফটিক। ‘যদি বাবা খুঁজতে আসে তাহলে তো যেতেই হবে। নইলে...’ থেমে গেল তার কথা।
‘নইলে কী?’ ফটিকের চোখ দুটি হঠাৎ ছলছল করে উঠল। তাই দেখে কল্পময় প্রসঙ্গ বদলাতে চাইল। দুজনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। খানিক পরে, কল্পময় বলল, ‘আচ্ছা, তুমি কী পড়ছিলে এত মন দিয়ে?’

‘অঙ্ক। অঙ্ক করতে খুব ভালো লাগে আমার। কিন্তু দেখ না, অঙ্কখাতাটা কদিন হল শেষ হয়ে গেছে। বাবাকে কতবার বলেছি... কিনেই দেয় না!’
‘আমার অনেক কটা নতুন খাতা আছে। তোমায় পরে এসে দিয়ে দেব একটা।’ আশ্বাস দেয় কল্পময়। তারপর, কী ভেবে বলে, ‘আচ্ছা, তুমি লাভ-লোকসানের অঙ্কগুলো পারো করতে? আমার স্কুলে সবে শিখিয়েছে।’

ফটিকের চোখ দুটি ক্ষণিকের জন্য দপ করে জ্বলে উঠল। ‘লাভ-লোকসানের অঙ্ক শুধু করতে নয়, চোখের সামনে দেখতেও পারি!’ শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

‘অঙ্ক দেখতে পার? সে কী জিনিস!’ ছেলেটা বলে কী! ওর মাথা ঠিক আছে তো? সন্দেহ হয় কল্পময়ের।

‘তুমিও তো দেখছ! চোখের সামনে দেখছ! এই যে এত জায়গা জুড়ে তোমাদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে, এগুলো ভেঙে যদি কারখানার কোয়ার্টার বানিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কত টাকার লাভ হবে, বলতে পারবে?’
কল্পময় সামান্য মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে নির্বাক। সত্যি তো, বাড়ি ভাঙার ব্যাপারটা সে ভুলেই গেছিল। খানিকটা সহানুভূতির স্বরেই যেন সে বলে ওঠে, ‘তোমার পড়ার জায়গাটা আর থাকবে না।’

এর কোনো উত্তর দিল না ফটিক নামের ছেলেটা। কল্পময় মাথা তুলতে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। ‘কই, কোথায় গেলে?’ কল্পময় চারদিকে চেয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই। আশ্চর্য তো, কোথায় গেল ছেলেটা? বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা শোঁশোঁ বাতাস বইছে। সেই সঙ্গে ধুলো এসে চোখে-মুখে লাগছে। তারই মধ্যে কল্পময় শুনতে পেল যেন, অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে কার একটা গলার স্বর, ‘বাড়িটা থাকবে না। কিন্তু আমি তো থাকব! তুমিও পারলে থেকো আমার সঙ্গে... আমার পাশে।’ তারপর খিলখিল করে সে কী হাসি! কল্পময়ের গা ছমছম করে উঠল এবার। আর দেরি না করে সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল।

এরপর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। কল্পময়দের ফিরে যাওয়ার বিকেল উপস্থিত। ওদের সমস্ত জিনিসপত্র সদর ফটকের সামনে এনে রেখেছে হারাধন। বেরোনোর আগে, কল্পময়ের হাতে সে একটি গাছপাকা আম তুলে দিল। বলল, ‘ট্রেনে যেতে-যেতে খেও, ছোটবাবু। আমার নিজে হাতে লাগান গাছের আম... তোমার মতোই তো ছিল গো আমার ছেলেটা... খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করো, হ্যাঁ? অনেক বড়ো হতে হবে তোমায়! আমার ছেলেটারও কী শখ ছিল স্কুল যাওয়ার। আমিই ওকে বলতাম, এবার

বাগানের কাজ-টাজ কিছু শেখ! ও অভিমান করে পশ্চিমের কুঠুরিতে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকত... কতবার বারণ করেছিলাম...' বলতে বলতে হারাধনের মর্চে-ধরা ফ্রেমের চশমার কাচ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

ট্রেন এখন ঝমাঝম শব্দে মণিকান্তপুর স্টেশন পেরিয়ে ছুটে চলেছে। কল্পময়ের কাঁধে হাত রেখে বাবা জানতে চাইলেন, 'তোর সব জিনিসপত্তর ঠিকঠাক ভরে নিয়েছিস তো? কত যে বইখাতা সঙ্গে করে এনেছিলি!'

কোলের উপর ব্যাগটার ভিতর চোখ বোলাল কল্পময়। সে জানে, একটা খাতা থাকবে না। তবে, মুখে বলল, 'সব আছে।' ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রাখার সময় তার হাঁটুর কাছটাতে চোখ পড়ল, এখনো কাঁটা ঝোপে আঁচড়ের দাগটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক-দুফোঁটা রক্তও দেখা যাচ্ছে। 'কোনও পোকাটোকা কামড়েছে, নাকি?' বাবা জানতে চাইলেন। কল্পময় কোনো উত্তর দিল না। শুধু জানলার বাইরে তাকিয়ে আপন মনে মৃদু হাসল।

কল্পময় তার কথা রেখেছে।

অঙ্কুর ঘোষ কলকাতার বাসিন্দা। 'শুকতারা', 'চিরকালের ছেলেবেলা' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তি হয়।

বাঘ শিকার

সুশোভিতা মুখার্জী

হাতিবাগানের ভাইটু মামার স্মৃতি আমাদের ভাই বোনেদের মনের মনিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বেশিদূর পড়াশোনা করেনি। তাই ভালো চাকরি করতো না। তবে যেকোন ব্যাপারে তার উৎসাহের কোন ঘাটতি ছিল না। পাড়ার রকে বসে আড্ডা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাট্যোৎসব থেকে শুরু করে সমাজসেবা, সব জায়গায় উপস্থিত ভাইটু মামা। আমাদের ভাই বোনেদের দুষ্টুমিতে তার সমর্থন থাকতো ষোলআনার ওপর আঠারো আনা। তাই ছোটদের কাছে সে ছিল হিরো। অবশ্য দাদুর চিন্তার কারণ ছিল, বলতেন অকম্মার ঢেঁকি। মামা মাসিরা অবশ্য চুপ করেই থাকতো কারণ তাদের বিপদ আপদে ভাইটু মামা সব সময় পাশে থাকতো।

একবার ভাইটু মামার খুব শিকারে যাবার শখ হলো। রঘুনাথপুরে ভাইটুমামার মামার বাড়ি। বাড়ির পাশে ঘন জঙ্গল। ঠিক হলো সেখানে টিম নিয়ে গিয়ে এয়ারগান দিয়ে প্র্যাকটিস করবে। তারপর ফরোয়ার্ড মার্চ টু সুন্দরবন। একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ভবলীলা সাঙ্গ করলেই হল। ব্যাস বাজিমাত! তারপর বুক চিতিয়ে হাতিবাগানের ক্লাবে ফেরা। জয়মালা, বড়দের সম্বর্ধনা, এই জীবনের মত তার কালিমা ঘুচে যাবে। যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে টিম তৈরি হলো। যোগেনদার বাড়ি থেকে শিকারের ড্রেস আর এয়ারগান ভাড়া করা হলো।
পাড়ার ছেলেরা প্রতিবাদ জানালো "ওসব তো নাটকের ড্রেস"

ভাইটুমামার সাফ জবাব "জীবনটাই একটা নাটক"।
ছেলেরা বললো "বন্দুক হাতে নিলে যদি বড় শিকারি হওয়া যেত তাহলে পাড়ার খোট্টা দারোয়ানও বড় শিকারি"।

ভাইটুমামা উদাসীন ভাবে বললো, "মেজাজটাই আসল রাজা, রাজা আমি নই। তাছাড়া শিকারির ড্রেস না পরলে বাঘগুলো হয়তো আমাদের চিনতেই পারবে না ,ভাববে বোকা কাঠুরের দল, তখন কি হবে একবার ভেবে দেখেছিস? তাই কথা কম কাজ বেশি।"

সবাই ট্রেনে করে গন্তব্য স্থলে রওনা দিল। সব ঠিকই ছিল কিন্তু সেই বুড়ি পিসির কথা আছে না "কপালে নেই ঘি ঠকঠকাইলে হইবো কি ?" ভাইটুর সেই অবস্থা হল। মামার বাড়ির জঙ্গলে দাঁড়িয়ে যেই ট্রিগারটা টেনেছে ওমনি টোটা ছুটলো হাজার কিলোমিটার বেগে জঙ্গলের পাশে যেখানে বড় দারোগাবাবু উঠোনে বসে শীতের মিঠে রোদ্দুরে রগড়ে রগড়ে তেল মালিশ করছিল। টোটা তীরবেগে ছুটে এসে দারোগাবাবুর ইয়া বড় টাকে এসে থমকে গেল। টাক লাল হয়ে ফুলে গেল আর দারোগা চিৎকার করে উঠলেন "মরে গেলাম মরে গেলাম"!

দেওয়ালের মোটা লাঠিটা হাতে নিয়ে তিনি কোন রকমে গামছা জড়িয়ে ছুটলেন খিড়কির দরজা দিয়ে ।
"আহাম্মক, বলদ, ছাগল, বানরের দল কসু বনে তোরা গোলাগুলি করস! একবার যদি ধরতে পারি" চিৎকার করে উঠলেন দারোগাবাবু। ভাইটু মামাও চিৎকার করলো "পালা পালা"। তারপর সবাই এক নিঃশ্বাসে পাঁই পাঁই ছুট, ট্রেনে চেপে সোজা হাতিবাগানের বাড়ি। বেশ কিছুদিন নিস্তেজ। কথা হাওয়ায় ছড়ায়। ভাইটুমামা দেখল সবাই তার পেছনে ফিক্ ফিক্ করে

হাসে। জেদটা আরও বেড়ে গেল, মনে মনে ঠিক করল "এর বদলা নিতেই হবে আর পারা যাচ্ছে না"। মার কাছে লম্বা চিঠি এল "এবার পুজোর পর ছোড়দি তোর কাছে থাকবো, জ্যাম্বোর সাথে শিকারে যাব"। বাবা বললে অগত্যা।

হাজারীবাগের খুব কাছে একটা ছোট্ট শহরে আমরা থাকতাম। বাবা পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করতেন। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে থাকতেন সত্য নারায়ণ মিত্র। ব্রিটিশরা বলতেন মিটার। তিনি ছিলেন বড়দের মিত্তিরদা আর ছোটদের মিত্তিরজেঠু। ওনার আরেকটা নামও ছিল - বয়লার মিত্তির। তখন প্রায় ৭০ এর কোঠায় বয়েস, সাড়ে ছয় ফিট লম্বা আর খুব সম্ভব সাড়ে তিনশ পাউন্ডের ওপরে ওজন। খুব অল্প বয়সে এক সাহেবের কাছে পাওয়ার প্ল্যান্টের বয়লারের ও টারবাইনের কাজ শিখেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অনস্বীকার্য।কোম্পানির তাবড় তাবড় ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ানরা, ওনার জ্ঞান ও হাতের কাজের কাছে হার মানতো। তখনো রিটায়ার করেননি কারণ কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চাইছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি না থাকলেও তিনি বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও হেড ছিলেন।

কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সবাই সমীহ করত। তবে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনেকটা কুম্ভকর্ণের মত ছিল। দিনের বেলা কচি পাঁঠার ঝোল খেয়ে লম্বা ঘুম দিতেন, রাত বারোটা বাজলেই জিপ নিয়ে চলে যেতেন পাওয়ার প্ল্যানটে। সেখানে বয়লার, টার্বাইন চেক করে ফল্ট বার করতেন আর অপারেটরের মাধ্যমে ফোন করে ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানদের হুমকি ছাড়তেন "কাম ইমিডিয়েটলি"। রাত্তিরের ঘুম বাদ দিয়ে সবাই দৌড়ত। একবার বৈজনাথ আর রামাধিন কোম্পানির দুই সিনিয়র টেকনিশিয়ান (অতি সজ্জন ব্যক্তি), বাবার কাছে এসে কেঁদে ফেলেছিল "স্যার পঁচিশ সাল রাত কো সোয়া নেহি"। সবার মনের এক কথা "এবার মিত্তিরদার রিটায়ার করা উচিত"।

মিত্তিরদার অনেক গুণ ছিল। ছোটবেলা সাহেবদের সাথে কাটিয়েছিলেন, তাদের সাথে শিকারে যেতেন, বন্দুক চালাতেও পারতেন খুব ভালো। কোনো এক ব্রিটিশের কাছ থেকে একটা রাইফেল কিনেছিলেন। শোনা যায় কুমায়ুনের জঙ্গলে দুই-চারটে চিতাবাঘও মেরেছিলেন। সেই রাইফেল সঙ্গে করে বোকারো এসেছিলেন। কেউ কথা না শুনলে মিত্তিরদা তার কপালে রাইফেল ঠেকিয়ে দিতেন। লোকাল কালচারাল ক্লাবের একটা শিকারের দল তৈরি করেন। মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়তেন হাজারীবাগের জঙ্গলের দিকে। টিমে ছিল আমার বাবা (বাবা ছিল তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র প্রায় ছেলের বয়সী), শর্মা আর রাজ আঙ্কল । বাবার দায়িত্ব ছিল গাড়ি চালানো ও গাড়ি ফিটফাট রাখা। কলকব্জা টায়ার ব্রেক সব ঠিক আছে কিনা, যাতে বিপদে পড়লে গাড়ি ছুটিয়ে বাড়ি ফিরতে পারা যায়। শর্মা আঙ্কেলের দায়িত্ব ছিল বন্দুকের বুলেটের হিসেবে রাখা। রাজ আঙ্কেলের কাজ ছিল টর্চ ধরা আর বেট তৈরি করা। মিত্তির জেঠু ছিলেন আসল শিকারি তবে হাজারীবাগে কোনদিন বাঘ শিকার করেননি। পাখি বনমুরগি বা ছোট হরিণ শিকার করে যখন তাঁরা টাউনে ফিরতেন আমাদের মুনলাইট পিকনিক হতো। হরিণের মাংস আগুনে ঝলসানো হতো আর সবাই মিলে গাইত "এই জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"।

যে সময়ের কথা লিখছি সেটা ছিল ৭০ দশকের গোড়ার দিকে। তখনো হাজারীবাগ জঙ্গলে শিকার নিয়ে সেরকম আইনকানুন চালু হয়নি অর্থাৎ শিকার বারণ ছিল না। একবার জঙ্গলের ধারে একটা চিতা বাঘ দেখতে পাওয়া গেল। রোজ রাত্রে বাঘটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামে ঢুকে হাঁস মুরগি যা পায় নিয়ে ভোরের দিকে জঙ্গলে ফিরে যায়। আরো শোনা গেল কাছেই কোন বস্তি থেকে একটা ছোট ছেলে কে বাঘে নিয়ে গেছে, তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মজদুররা ক্রমে ভয় পেতে শুরু করল এবং এই পথে কাজে আসা বন্ধ করল। পাওয়ার প্ল্যান্টের এর কাজ প্রায় যখন বন্ধ হতে চলেছে, তখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জানতে পেরে মিত্তিরদাকে বললেন "মিটার কিছু ব্যবস্থা কর"। এই পটভূমিকায় ভাইটুমামার আগমন ঘটলো। বাবা ভাইটু মামাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন মিত্তিরদার বাড়ি, পরিচয় করিয়ে বললেন "শালা বাবুর শিকার যাবার শখ হয়েছে"।

মিত্তিরদা চুপ করে থেকে বললেন "তুমি রাইফেল চালাতে পারো?"
মামার কান লাল হয়ে উঠলো, উত্তর দিল "মানে ওই আর কি,তবে দু'চারটে কাক মেরেছি"।
"বাঘ আর কাক কি এক হল?" মিত্তিরদা বিরক্ত হলেন "কি দিয়ে মেরেছো"।
"কেন স্যার গুলতি দিয়ে? টিপ করে মারতে পারলে বাঘ আর কাক সবই মারা যায়। সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেব।"
এইবার মিত্তিরদা হেসে ফেললেন। পাইপ রেখে, গলা খাকরে বললেন, "ওহে ছোকরা তোমার গুলতির টিপ দেখতে হচ্ছে। সামনেই অমাবস্যা তাহলে শিকারের আয়োজন করা যাক"

এক অমাবস্যা রাতে শিকারির দল যাত্রা শুরু করলো জঙ্গলের দিকে। মা "দুর্গা দুর্গা" করতেই ভাইটুমামা বলল "দিদি চিন্তা করিস না, হাজারীবাগ এসে একটা চিতা বাঘ না মারলে কলকাতা গিয়ে মুখ দেখাবো কি করে?"

ঠিক হল স্পটে গিয়ে বাবা দূরবীন দিয়ে বাঘ সাইট করবে, ইশারা করলে ভাইটুমামা পাঁচটা ব্যাটারি ওয়ালা ফ্লাশ লাইট ফেলবে বাঘের মুখে, আঙ্কেল তখন আস্ত রক্তমাখা মুরগির বেট ছুড়বে। মিত্তিরজেঠু রাইফেল দিয়ে প্রথম দুটো বুলেট ফায়ার করবে তারপর বাঘ ঘায়েল হলে ভাইটুমামা এয়ারগান দিয়ে টোটা ছুঁড়বে। ভাইটু মামার শিকারের ইচ্ছে পূরণ করার জন্য তাকে দেওয়া হল একটা এয়ারগান।

"বাট নো গুলতি" শাসিয়ে দিলেন মিত্তিরদা। তাতে বাঘ ডিস্ট্রাকটেড হয়ে তাদের দিকে লাফ মারতে পারে।

খোলা জিপগাড়ি চালিয়ে বাবা যখন স্পটে পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় বারোটা, চারিদিকে ঘন জমাট অন্ধকার, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাবা গাড়ির হেডলাইট অফ করে দূরবীন দিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলেন। গাড়ি দাঁড় করানো হলো একটা টিলার ওপর, সামনেই ঝরনা, ওপারে ঘন জঙ্গল। সবাই চুপ করে বসে রইল। শুধু জোনাকির আলো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোথাও প্রাণের চিহ্ন ছিলনা। ভাইটুমামাকে বসানো হয়েছিল জীপের পেছনের সিটে। রাত বয়ে চলল আর মশার কামড় বাড়তে লাগলো।
জেঠু বললেন "আর পারা যাচ্ছে না। মহাপ্রভুর দর্শন কখন পাওয়া যায় দেখ।"

হঠাৎ শর্মা আঙ্কল ফিসফিস করে বললে "ওই আসছে"।
বিরাট একটা শরীর মাতালের মতো টোলতে টোলতে এসে দাঁড়ালো ঝরনার পাড়ে।
শর্মা আঙ্কল দাঁত চেপে বললেন "ভাইটু টর্চ ফেল।"
ভাইটুমামার শরীর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। যা করবার কথা ছিলনা ভাইটুমামা তাই করে বসল। পৃথিবীর ইতিহাস বোধহয় এইভাবেই রচিত হয়। পকেট থেকে গুলতি বার করে টিপ করে বল ছুঁড়তেই জিপের সামনের কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল।

“ইয়ে সব কেয়া হো রহা হ্যায়” চিৎকার করলেন শর্মা আংকেল

প্রচন্ড কনফিউশন। স্টেজে উঠে ডায়ালগ ভুলে যাবার মত অবস্থা। মিত্তিরদা ভাইটুমামাকে থাবড়া মারবেন না রাইফেল চালাবেন বোঝা যাচ্ছেনা। এবারে মিত্তিরদার হাত থেকে বন্দুক মাটিতে পড়ে গেল। বাবা বেগতিক দেখে জিপ গাড়ি ঘোড়াতেই মিত্তিরদার বিশাল শরীর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাদার মধ্যে। বাঘ বেগতিক দেখে যে পথে আগমন সেই পথেই হেলতে দুলতে নিষ্ক্রমণ হলো। কোন রকমে টানা হিঁচড়ে করে মিত্তিরদাকে জীপে তুলে বাড়ির দিকে গাড়ি ছোটালেন বাবা।
মিত্তিরদার তুই পা ভেঙে গিয়েছিল। ছয় মাস বিছানায় শুয়ে। বাবাকে রাগ করে বললেন “আহাম্মক ছেলে গুলতি দিয়ে বাঘ মারবে!”

তারপর যখন ভালো হলেন ঠিক করলেন এবার রিটায়ার করে কলকাতা ফিরবেন এবং জানিয়ে দিলেন ওপরওয়ালাদের। বাঘ আর উৎপাত করেনি, অন্তত আর শোনা যায়নি। এক সন্ধ্যেবেলায় মিত্তিরদা আর বৌদি তলপি তলপা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন। আমাদের মন খারাপ হলেও আমি কিন্তু নিশ্চিত বৈজনাথ আর রামাধিন তারপর থেকে পরম শান্তিতে রাত্রিতে ঘুমিয়ে ছিল।

.

সুশোভিতা মুখার্জি ওহায়ো স্টেটের মমি শহরের বাসিন্দা । অ্যান আর্বার মিশিগানে রিসার্চ সায়ানটিস্টের কাজে ব্যস্ত থাকেন । মাঝে মাঝে অবসর পেলে নিজের জীবনের ঘটনাবলি থেকে কোনও কোনও মজার অভিজ্ঞতা পাঠককে আনন্দ দেবার উদ্যেশে লিপিবদ্ধ করেন ।

স্রোতে ফেরা

দেবাশিস দাস

ঝকঝকে এস ইউ ভি গাড়ীটা মন্দিরের পারকিং লট থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পরার মুখেই ট্রাফিক পুলিশ সেটাকে হাত তুলে দাঁড় করাল। প্লাবন তখন সবে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে গুগল ম্যাপে ডেসটিনেশন সেট করে পথের হাল হদিশ দেখে নিচ্ছিল। আজ বহুকাল, প্রায় কুড়ি বছর, পরে স্কুলের বন্ধুদের সাথে গেট টুগেদার। মন্দিরে ভিড় থাকার কারনে বেশ দেরিও হয়ে গেছে। তার ওপর আবার এ কি ফ্যাসাদ।

গাড়ী থেকে নেমে আসতেই ট্রাফিক পুলিস বলল 'আপনি সিট বেল্ট পরেন নি। গাড়ীর কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হবে আর তার সাথে হবে হাজার টাকা জরিমানা'। 'ডাক্তার হিসেবে রুগী দেখতে যাওয়া হচ্ছে', 'সবে গাড়ীতে ওঠা হয়েছে', 'সিট বেল্ট লাগানোই হত', 'জরিমানা কিসের'? ইত্যাদি অনেক অজুহাত, বাগবিতণ্ডার পরও কাজ না হওয়াতে অবশেষে রাস্তার কোনে গিয়ে কিছু টাকা পুলিসের হাতে গুঁজে দিয়ে ছাড়া পাওয়া গেল। সহজ উপায়। মনে মনে হাসল প্লাবন।

*****

জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল। গঙ্গার পারে অমিতদের এই দোতলা বাড়িটা অনেক পুরনো। বহুকাল কোন মেরামতিও হয় নি। ঢাউস আসবাবপত্রগুলোও সেই প্রাচীনতার গন্ধ বহন করছিল। স্কুলে পড়ার সময় আমিতের বাড়িতে প্রায়ই বন্ধুরা মিলে আসা হত এখানে। গঙ্গার পারে বসে আড্ডা, ছাদে ঘুড়ি ওড়ান, আমিতের ঠাকুমার আচারের বয়েম চুরি করে খালি করে দেওয়া, ইত্যাদি কত কি সাক্ষ্য বহন করছে এই বাড়িটা।

আমিত ছাড়া আর কোন বন্ধু অবশ্য এখন আর এইদিকে আসে না। সবাই যে যার কর্মস্থলে অধিষ্ঠিত। অমিতও কোলকাতায় থাকে, কিন্তু গঙ্গার পারের তাদের এই পারিবারিক বসতবাটিতে প্রতি মাসেই আসে সে। প্লাবন এখানে স্কুল শেষ করে ডাক্তারি পড়তে কোলকাতায় চলে যায়। তারপর বিদেশে অনেক বছর কাটিয়ে বছর দুই হোল দেশে ফিরে কোলকাতায় একটা নার্সিং হোম বানিয়ে প্রাকটিস করছে। বেশ পসার হয়েছে তার। ভীষণ ব্যস্ততা থাকলেও পুরনো বন্ধুদের গেট টুগেদার মিস করবে না বলে অনেক কষ্টে আজ সন্ধ্যেটা বার করেছে।

'তুই তো খুব ভালো গান গাইতিস। একটা গান শোনা'। বন্ধুদের আবদারে প্র্যাকটিস না থাকলেও প্লাবনকে শোনাতে হলো 'আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে... তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ...'। সমবেত প্রশংসার মাঝেই স্ন্যাক্স দেওয়া হোল। পানীয়র গ্লাস হাতে সবাই পুরনো দিনের গল্পে মশগুল। অমিত একটা ছোট ব্যবসা করে। বিশেষ যে চলে না সেটা, সে কথা ও নিজেও জানে। কলকাতাতে ভাড়া বাড়িতে থেকে কোনরকমে ওদের দিন গুজরান হয়। স্থাবর সম্পত্তি বলতে, এই বাগানবাড়িতে নিজের ভাই বোন ও অন্যান্য শরিকদের সাথে তারও একটা সামান্য অংশ আছে।

স্কুলের কথা অমিতই বেশি বলছিল- 'জানিস প্লাবন, আমি কিন্তু মানব স্যারের কথা সব সময় মেনে চলার চেষ্টা করি। উনি বলতেন- "অমিত কখনো নিজের জন্য বাঁচবে না, জানবে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"। সত্য পথ আর পরের জন্য বাঁচা- এই পথ অবলম্বন করে বেশ সুখে আছি আমি'।

‘হ্যাঁ বাবা তো তোকে খুব ভালবাসতেন। বলতেন অমিতটা খুব বড় মাপের মানুষ হবে একদিন’।

মানব স্যার, মানে প্লাবনের বাবা, এই স্কুলের একজন ছাত্রবৎসল শিক্ষক ছিলেন। ছাত্ররাও দারুন ভালবাসত তাকে।

‘হ্যাঁ সফল জীবন আমার হয়নি। ছেলেমেয়েরা আমাকে সব সময় কমপ্লেন করে, আমি নাকি ব্যবসা করতে পারি না। হ্যাঁ চুরি-চামারি আমি কখনো করিনি ঘুষ দিতে পারি না, নিতে পারি না। গড্ডালিকা স্রোতে ভাসতে পারিনি। তাই হয়তো আমি অসফল’।

‘আরে অমিত আমরা যে যার মত। এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। বাবা হয়তো একটু পুরনো পন্থী ছিলেন। এখনকার কাল হলে নিশ্চয়ই অন্য কিছু বলতেন। সময়ের সাথে সাথে সব কিছু বদলে যায়, এমনকি হয়ত ভালমন্দের ধারণাও’। মনে মনে ভাবল প্লাবন নিজে এত সফল হয়েছে পরিস্থিতির সাথে নিজেকে বদলে ফেলে। এতে ভালমন্দের হিসেব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ত বদলে গেছে তার। তাতে কি? কোন একটা বিজ্ঞাপনেও দেখেছে, ‘যে ফ্লেক্সিবেল সেই সফল’।

‘কিন্তু সত্য সবসময় একই থাকে প্লাবন’। আমিত নিজের যুক্তিতে অনড় থাকতে চাইল। ‘হয়তো সময় বিশেষে মানিয়ে নিতে হয়। আমি সেটা পারিনি। হয়ত মানাতে চাইও নি। তাতে কোন ক্ষতি হয়নি অবশ্য’।

প্লাবন শুনেছে অমিতের অন্য ভাই-বোনেরা নিজেদের অংশ, দোকানের জন্য বা অন্যান্য পরিবারকে থাকার জন্য ভাড়া দিলেও অমিত কিন্তু নিজের অংশে তার দাদুর আমলের কাজের লোককে পরিবার সমেত থাকতে দিয়েছে। তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্বও নিয়েছে।

অমিতের অংশের সামনের বাগানে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়ার পর গল্প হচ্ছিল। সবাই স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা, স্যারদের কথা বলছিল। হঠাৎ সুধন্য বলল ‘স্যারদের সব কথা আমরা হয়তো জীবনে মেনে চলতে পারেনি। কিন্তু মোটামুটি একটা মূল্যবোধ আমাদের সকলেরই তৈরি হয়েছে’।

‘সেই মূল্যবোধই তো আমাদের চলতে সাহায্য করছে’। বিজন সমর্থন করল সুধন্যকে।

এমনি নানা কথার মধ্যে শ্যামল বললো ‘একটা ব্যাপার তোরা হয়তো অনেকেই জানিস না। মানব স্যার তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়। পাঁচ-ছয় মাস ধরে অসুখে ভুগছেন। স্কুলে প্রত্যেকদিন আসতে পারেন না। আসলেও ক্লাস নেওয়া খুব অনিয়মিত। শেষ দু মাসে তো আসতেই পারেননি একদম। এই কারণেই শেষের কয়েক মাসের মাইনেও নেননি তিনি। স্কুলে এসেও।

সেই সময় একদিন হেডস্যার স্কুল থেকে দপ্তরির হাত দিয়ে আটেন্ডেন্স রেজিস্টার পাঠিয়েছিলেন শয্যাশায়ী মানব স্যারের কাছে। দপ্তরি পুরনো লোক। সে খুব শ্রদ্ধার সাথে অনুরোধ করেছিল– ‘স্যার কিছু মনে করবেন না, হেডস্যার পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনি তো গত মাস ছাড়া আগের মাসগুলোতে স্কুলে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারে সই করেননি। যদি এই রেজিস্টারে কয়েকটা সই করে দেন তবে শেষ তিন-চার মাসের মাইনে পেতে অসুবিধা থাকবে না। টাকাটা আপনার চিকিৎসার কাজে লাগবে। স্যার এ তো আপনারই অর্জিত টাকা। তাছাড়া এখন নিজের চিকিৎসার সাথে ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতেও তো আপনাদের অনেক খরচ’।

স্যার কিন্তু হাজার অনুরোধেও একটাও সই করেননি। বলেছেন 'স্কুলে গেছি বটে, কিন্তু রোগের জন্য ছাত্রদের ভালোভাবে শিক্ষাদান করতে পারিনি। এই সময়ে শিক্ষক হিসেবে কোন পারিশ্রমিকের যোগ্য আমি ছিলাম না। এই অনুরোধ আমাকে করোনা। আমার এত দিনের শিক্ষক জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, এই টাকা নিলে'।

'হ্যাঁ একথা আমিও শুনেছি অনেক পরে ওই দপ্তরির কাছে'। অম্লানের গলায় কিছুটা আবেগের সঞ্চার হয়েছে যেন। 'তবে এই ঘটনা স্যারেরা অনেকেই বা ছাত্ররাও বিশেষ কেউ জানে না। আমার মনে হয় প্লাবনও জানে না একথা। এর কিছুদিন পরেই তো স্যার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন'।

প্লাবন সত্যিই জানতো না একথা। বাবার মৃত্যুর পর মা খুব বিপদে পড়েছিলেন। তাদের সংসারে খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল তখন। সেই সময় প্লাবনেরও বিদেশে পড়তে যাওয়ার কথা। কিছু স্কলারশিপ জোগাড় হয়েছিল। আর মা তাদের সামনের জমিটুকু বেচে কোনরকমে প্লাবনের বিদেশ যাওয়ার অর্থ জোগাড় করেছিলেন। বাবা নাকি সেরকমই বলে গিয়েছিলেন তাকে। অনেক পুরনো দিনের কথা।

প্লাবনের সামনের গঙ্গা নদীটা হঠাৎ কেমন যেন ঝাপসা দেখাচ্ছিল। অসময়ে কুয়াশায় ছেয়ে গেল কি চারদিক?

'প্লাবন একটু এদিকে আয়'। অমিতের ডাক শুনে পাশের পেয়ারা গাছের নিচে প্রায় অন্ধকার জায়গাটায় এসে প্লাবন দেখল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রক পরা একটি মেয়ে।

'লক্ষ্মী, এই হলো প্লাবনকাকু। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। আমার গুরুর ছেলে। আর প্লাবন, লক্ষ্মী হচ্ছে আমাদের দাদুর আমলের লোক বলাই কাকার নাতনি। ওরা এ বাড়ীতেই থাকে আমার অংশটায়। ও ক্লাস এইটে পড়ে। পড়াশোনা করে বড় হতে চায়। স্যারের কথা, তোর কথা আমি লক্ষ্মীকে অনেক বলেছি। তোকে কোনদিন দেখেনি তাই আজ দেখতে চেয়েছে। তোকে একটা প্রণাম করতে চায়। তোর মত ভালো হতে চায় ও'।

'প্রণাম কেন গো মেয়ে, আমি এমনি আশীর্বাদ করছি তোমাকে, অবশ্য আশীর্বাদ করার যোগ্যতাই হয়তো আমার নেই'।

বলতে না বলতেই ঢিপ করে তাকে প্রণাম করল মেয়েটি। এত অপ্রস্তুত জীবনে কখনো হয়নি প্লাবন। মুহূর্তে ভেসে উঠল আজ সন্ধ্যার ছবি। সিগন্যালের নিচে দাঁড়িয়ে একটি মানুষ মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা গুঁজে দিচ্ছে ট্রাফিক পুলিশের হাতে। ভাবল 'সেই মানুষটি কি করে নিচ্ছে প্রণাম'? পরক্ষনেই আবার মনে হল, 'এতো স্বাভাবিক এবং নিত্যদিনের ব্যাপার। এতে অপরাধ বোধ জন্মাচ্ছে কেন? একটি প্রনামের জন্য'? সে তো জানে এই প্রণাম মেয়েটি করছে তার বাবাকে'। বড় দ্বন্দ্ব চলতে লাগল মনের ভিতর।

এরপর আরো ঘন্টাখানেক ছিল তারা। বন্ধুদের গল্পগাছাতে খুব একটা যোগ দিতে পারছিল না সে। বার বার বাবার মুখ ভেসে উঠছিল। লক্ষ্য করছিল, মেয়েটি দূর থেকে মাঝে মাঝে শ্রদ্ধার সাথে দেখেছে প্লাবনকে। হয়তো খুঁজেছে তার বাবার ছায়াকে।

****

রাস্তা এখন বড় শুনশান। ড্রাইভার বলছে এক ঘন্টার মধ্যে কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে যাবে তারা। আজকের ব্যাপারটা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। তাকে কি ভেতর থেকে খানিকটা নাড়িয়ে দিল এই অভিজ্ঞতা। তার বয়ে যাওয়া জীবনের স্রোতে কেন এই তরঙ্গ উঠল। এত ঔজ্জ্বল্য এত স্বচ্ছলতা সে অর্জন করেছে কিসের বিনিময়ে? জীবনটা কি আরও একটু অন্যরকম হতে পারত তার? রাস্তার মফঃস্বলি আলোর মতোই ম্রিয়মাণ হয়ে রইল সে।

ঠিক সেই সময়ই ফোনটা বেজে উঠল। প্লাবন দেখল এক ওষুধের ডিলারের ফোন। 'ডাক্তারবাবু, আপনার ও বৌদির দুজনের ইউরোপ ট্রিপের ভিসা, টিকিট সব রেডি হয়ে গেছে। সামনের সপ্তাহে যাত্রার দিন। আপনার নার্সিংহোম থেকে স্যার ওষুধ আর ল্যাব টেস্টের রেফারেন্সগুলো আমরা নিয়মিত পেয়েছি। দেখছেন তো আমরা সেটা ভুলে যাই নি। আশা করি আগামী দিনেও আমাদের আপনি বঞ্চিত করবেন না। কালই লাঞ্চের সময় আপনার চেম্বারে আপনাদের পাসপোর্ট আর টিকিট ইত্যাদি দিতে আমাদের লোক যাবে। গুডনাইট ডাক্তারবাবু'।

প্লাবন জানে যে এদের লোকাল কোম্পানির ওষুধের স্ট্যান্ডার্ড খুব ভালো নয়। এদের ল্যাবও খুব ওয়েল ইকুইপ্ট নয়। পুরনো যন্ত্রপাতি। সবসময় সঠিক রেজাল্ট নাও আসতে পারে। তবু দরকার থাকলে বা না থাকলেও এদের কোম্পানির ওষুধ লেখে এবং নানারকম দামী ল্যাব টেস্টের জন্যও এদেরকে রেফার করে সে। রোগীর স্বাস্থ্য নিয়ে, জীবন নিয়ে হয়ত কিছুটা ছিনিমিনি খেলতে হয় তাকে। কিন্তু কি করা যাবে? নিজের দিকটাও তো দেখতে হবে তাকে। তাদের এই উজ্জ্বল জীবনযাত্রার খরচা অনেক।

মনমরা ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল। সামনে তাকিয়ে দেখল নিভু নিভু মফঃস্বল থেকে আলো ঝলমলে কলকাতা শহরে প্রবেশ করছে তার গাড়ি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফোনটা বের করে তাড়াতাড়ি ডায়াল করলো স্ত্রীকে- 'রাকা ঘুমিয়ে পড়েছ? একটা ভালো খবর আছে'।

দেবাশিস দাস বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় 'তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের' কাজে রত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি বাংলার বাইরে বঙ্গসংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তার নেশা অবশ্যই সাহিত্যচর্চা, বিশেষত: একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি করেছেন। বিগত কয়েকবছর ধরে নানান পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার চেষ্টা করছেন।

ভেলু মামার গল্প

ঝর্না বিশ্বাস

ভাই, রুবাই একদম তোর মত হয়েছে।

দিদির প্রতিবার নালিশ করে শুধু ওর পড়াশোনা নিয়ে। এদিকে সারা ঘর তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রুবাই, এত দিন পর মামা মামিকে পেয়ে ভীষণ খুশি। মামা এলেই কত গল্প শোনা যায়। গতবার মামা ওকে ছোটবেলায় পুরীতে ঘুরতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার গল্প বলেছিল। তারপর কিভাবে রুটির দোকান থেকে উদ্ধার হলো তাও।

দাদুর ছুরি হারানোর গল্পটা মায়ের কাছ থেকে শোনা। দাদুর ছিল রান্না করার শখ। মামা একবার সেই বড় ছুরি নিয়ে গেছিল ঝুলনের জন্য গাছের পাতা, আর ডাল কাটবে বলে। সেদিন তন্ন তন্ন করে যখন কোথাও ছুরি খুঁজে পাওয়া গেল না, দাদু সেদিন মামাকেই ধরলেন। এ কাণ্ড একমাত্র নাকি সেই করতে পারে। তারপর অনেক ঝক্কির পর তা খুঁজে পাওয়া গেছিল। উঠোনের একপাশে শুকনো পাতা সব জড় করা হত ঝাঁট দিয়ে। মামা তার ভেতরে ওটা লুকিয়ে রেখেছিল পিটুনি খাওয়ার ভয়ে। এবং তা যখন দাদুর হাতে এলো, চেহারাটা বেশ শোচনীয় হয়ে গেছে। ভোঁতা হয়ে গেছে ধার। অগত্যা গুম গুম করে পিঠে কটা কিল পড়লেও, মামা আবার যেই কে সেই।

রুবাই এ কথা শুনে মা-কে জিজ্ঞেস করেছিল,
তাহলে তো মামা খুব দুষ্টু ছিল, তাই না?
মা-ও হেসে নিয়ে বলেছিল। দুষ্টু মানে! এখনও হাঁটুর কাছে কাটা দাগ আছে। ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে দৌড়তে গিয়ে পাঁচিল থেকে পড়ে গেছিল তোর মামা। সেলাইও পড়েছিল ছ খানা।

যদিও মামা ওদের এখানে এলে সেই পুরনো দিনের কথা খুব গর্বের সাথে রুবাইকে শোনায়। আর রুবাইও এমন গল্পে হারিয়ে যেতে খুব ভালোবাসে। মামা ওর কাছে সুপার হিরো, যে কোন অসম্ভব কিছু নিমেষে সম্ভব করে দিতে পারে।

আজও তাই আগে থেকে রুবাই গুছিয়ে নিয়েছে সব...স্কুলে দেওয়া হোমওয়ার্কের কিছুটা এখনও বাকি।
এদিকে রুবাইকে কাছে টেনে নিয়ে মামা বলল,
আজ তোকে ভেলুর গল্প শোনাব। তাড়াতাড়ি পড়া করে আয়।
রুবাই কৌতূহলে মামার দিকে তাকিয়ে বলল,
ভেলু!! সেটা কে গো?
মামা মুচকি হেসে নিয়ে,
ভেলু। ও আমার খুব চেনা লোক রে...

দুপুরে খেতে বসে আজ কোনো বায়না করল না রুবাই। মা ডাল চটকে ভাত মাখিয়ে দিল, পাশে দিল মাছের টুকরো।
অন্যদিন মাছ দেখলেই তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আজ শব্দটুকু নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর ওর ঘরে এলো রুবাই। মামা আগে থেকেই ও ঘরে ছিল। তারপর বিছানায় উঠে মামার খুব কাছ ঘেঁষে বসল। দরজা আলতো ভেজিয়ে রেখেছিল যাতে মামা আর ওর গল্পের মধ্যে কেউ বিরক্ত করতে না আসে।

এরপর মামা গল্প শুরু করল...

এটা সেদিনকার গল্প বুঝলি, যেদিন ভেলুর রেজাল্ট বেরিয়েছে। আর ভেলুকে বরাবরের মত কোত্থাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না...এই একটা দিন ও খুব ঠাকুরকে ডাকত। একবার তো প্রতিজ্ঞাই করে ফেলল, পাশ করলে পর পর দুই বৃহস্পতিবার উপোষ করবে। কিন্তু সব ঘেঁটে গেল। সে বার অঙ্কটা কোনও মতে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলেও, ইতিহাসে এলো গোলা।
রুবু গায়ের চাদরটা অল্প টেনে নিলো। এসি-তে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ঘরটা। কাত হয়ে শুয়ে পড়ল মামার পাশে।

মামা আবার শুরু করল।

সবাই তখন ভেলুকে খুঁজছে আর ভেলু সোজা ছাদে উঠে গেছে। এবার অঙ্কে ফেল, তাই মুখ লুকোতে গিয়ে বসে পড়েছে জলের ট্যাঙ্কের পাশে। ওখানে বসে বসে ও তখনও হিসেব কষছে, এবার মিনিমাম ওর পঁয়ত্রিশ পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে একেবারে এগারো হলো কি করে! ওর মনে পড়ছিল সেদিন ক্লাসে খাতা দেখানোর কথাটাও...

প্রতি বারের মত অঙ্ক খাতার বান্ডিল নিয়ে হিমাংশু স্যার যখন ঢুকছিলেন, ক্লাস ছিল একদম শান্ত। কেউ কেউ অষ্টতর শতনাম জপ করাও শুরু করে দিয়েছিল, কেউ আবার ভগবানকে ঘুষ - এবার পাশ করিয়ে দিলে আর পড়াতে ফাঁকি দেব না।

স্যার ঢুকেই স্বভাব মত ডাস্টার পিটোলেন, ও প্রথমেই ডাক দিলেন পিন্টুকে। যত বিষয়ের হায়েস্ট মার্কস সব ওর ঝুলিতেই থাকে। তবে সকালে দেখানো ইতিহাস খাতায় নতুন মেয়েটা আড়াই নম্বর বেশি পেয়েছে। পিন্টুকে টপকাতে এই একজনই যথেষ্ট ভেবে বেশ কিছুক্ষণ খুশিতে ছিল ভেলু। তারপর এক এক করে খাতা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে স্যার সবাইকে ঘোলা চোখে দেখে নিচ্ছিলেন। এবার ভেলুর ডাক পড়ল।

ও স্যারের সামনে এসেই হাত বাড়িয়ে দিল। যেন প্রসাদ নিতে এসেছে। স্যার একবার প্রাপ্ত নম্বরে চোখ বুলিয়েই হামলে পড়লেন ভেলুর ওপর।
হতচ্ছাড়া, অঙ্ক খাতায় কাটাকুটি করার এই ফল।

নে, এইবারেও ডাব্বা।

স্যারের কথাগুলো ক্লাসের ভেতর গমগম করছিল। ভেলু, স্যারের অনেকটা কাছে এসে দেখল, চুলের সাথে সাথে স্যারের গোঁফেও কিছু পাক ধরতে শুরু করেছে।
এরপর খাতা নিয়ে ও অনেকক্ষণ বসে থাকল লাস্ট বেঞ্চে, তারপর জমা দিতে এগোলে স্যার বললেন,
কী সমস্যা রে তোর? অঙ্ক ছাড়া কিন্তু আর নতুন ক্লাসে ওঠা হচ্ছে না!
স্কুলের সব কথা মনে পড়ছিল এক এক করে, তাই ছাদে বসে খানিক চিন্তায় ও বাঁ হাতের ছোট আঙুলের নখটা কুট কুট করে খুঁটছিল।

ওর সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল ক্লাসের নতুন মেয়েটার ওপর। এসেই সবার কেমন চোখের মণি হয়ে গেছে। উল্লাস স্যারের ডান্স ক্লাসই হোক বা বিজয় স্যারের জ্যামিতি, সব কিছু ওর মাথায় কী সুন্দর করে ঢুকে যায়। আর ভেলু সেখানে কোনও মতে বিষয়গুলো বোঝে, যদিও বেশির ভাগই ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুট্টে বেরিয়ে যায়...

এদিকে বাড়ির মাস্টার পল্টুদাও যখনই পড়াতে আসে ওই মেয়েটার কথা বলে। কত প্রশংসা করে ওর! নতুন এসেই নাকি সব মাস্টার দিদিমণিদের খুব প্রিয় হয়ে গেছে। পল্টুদা আরো বলে,

একটু তো আলাপ করলে পারিস ওর সাথে। কখন পড়ে, কিভাবে পড়ে, কখন অঙ্ক করে, কি কি বই আছে সব জানবি,অনেক কাজে দেবে।

ভেলু তাই ভেবে রেখেছে একবার আলাপ সারতেই হবে মেয়েটার সাথে।

রুবাই এদিকে আনচান করছে সেইদিন ভেলুর কী হলো নিয়ে। মা ঠিক তখনই দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে গেল। মামা আবার বলা শুরু করল...

ভেলুদের বাড়িতে সেদিন বেশ চেঁচামেচি চলছে। ওর বাবা আর কাকুনের হম্বিতম্বিতে ছাদ থেকে অবশেষে নামতেই হলো ভেলুকে।

তারপর ঘরে ঢুকতেই দেখে টেবিলের ওপর হলুদ রঙের মার্কশিটটা উপুড় হয়ে আছে। আর পাশে সেদিনের খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছে। পিসি পাশের ঘর থেকেই আন্দাজ পেয়ে গেছিল, ভেলু আবারও ডাহা ফেল, তাই এত চোটপাট চলছে।

ভেলুর বাবা তখন চশমাটা নাকে এঁটে ওপর থেকে নীচে হলুদ কাগজটার ব্যবচ্ছেদ করছিলেন। ভেলু শুধু একভাবে দেখছিল বাবাকে। ব্যাঙেরও নাকি এমন করেই পেট কেটে ওর হৃদপিণ্ড দেখে রজতদা। রাজুর থেকে মাত্র কয় ক্লাস উঁচুতে পড়ে রজতদা। আর রাজুর বিজ্ঞানের আগ্রহে ওকে প্রায়ই এসব গল্প শোনায়।

একবার রজতদা বলেছিল বিজ্ঞানের প্র্যাক্টিকালে কেমন করে ক্লোরোফর্ম খাওয়া ব্যাঙগুলো আধমরা হয়ে থাকে। তারপর ওদের শুইয়ে দেওয়া হয় ট্রে-র ওপরে। তখনও নাকি বুকটা ওদের ধুকপুক ধুকপুক করে।

ভেলু একবার জিজ্ঞেসও করেছিল,
তোমার ভয় লাগে না রজতদা।
রজতদা হেসে নিয়ে বলেছিল...

ভয় কি রে...শিখতে হলে জানতে হয়, আর জানতে হলে এটুকু তো করতেই হবে।

সেদিন থেকেই বিজ্ঞান ভেলুর খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রজতদার কাছেও ভেলু ছিল এক বোঝদার ছেলে তাই সে সবসময় বলত,

-তোর খুব বুদ্ধি রে ভেলু, পড়াশুনাতে কেন যে কাজে লাগাস না...

ভেলুর খুব আপসোস হত এটা শুনে। যদিও স্বপ্ন দেখত। দেখতে পেত নিজেকে। ক বছর পর সাদা ল্যাবকোটে বায়োল্যাব থেকে বেরোচ্ছে অনাদি পাড়ার ভেলু, উর্ফ রাজু মণ্ডল!

ঘরে বাবার বিকট আওয়াজে সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হতে মাত্র ক সেকেন্ড সময় লাগলো।

বাবা কাকুনকে বলে দিল, এবার থেকে ওকে আমাদের দোকানে নিয়ে যাবি। পড়াশোনা আর হবে না। দোকান দেখভাল করবে, কর্মচারীর খরচ কমবে।
ভেলুও প্রতি বারের মত কাকুতিমিনতি করছিল দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে।
প্লিজ, এইবারের মত ছেড়ে দাও। এটা হাফ ইয়ার্লি ছিল। ফাইনালে ঠিক পাশ করে দেখাব।

তাও একটা ভয় কাজ করছিল ভেতরে। বাবার কথাই যদি সত্যি হয়। ও যদি আবারও ফেল করে...

তাহলে সেই দোকানে বসতে হবে। আর সারা গায়ে লেগে থাকবে কেরোসিন গন্ধ। ও এখনই তা টের পেত বাবা আর কাকুন দোকান থেকে ফিরলে। কিন্তু ওর এমন হলে বন্ধুরাও আর কেউ মিশবেনা। তার ওপর টিটকিরি তো সবাই এখন থেকেই দেয়। ওকে স্কুলে সবাই কেরোসিন বাড়ির ছেলে বলে ক্ষ্যাপায়।

যদিও 'পাশ করার জন্য' কি ভাবে পড়া উচিত তা নিয়ে ভেলু একটা লম্বা লিস্ট বানিয়ে ফেলল। এর আগেও এ রকম বহু লিস্ট ও বানিয়েছিল কিন্তু পরে তা জানালা দিয়ে গিয়ে জমা হত বুল্টিদের পাঁচিলের পাশে। একবার তো মহা ঝামেলা। বুল্টির মা চেঁচিয়ে পাড়া জোগাড় করার মত অবস্থা। কেরোসিন বাড়ির লোকেরা নাকি তাদের জায়গা নোংরা করছে।

বলেই মামা খানিক চুপ হয়ে গেল...
মনে হচ্ছিল রুবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে রুবাইয়ের গোল চোখ অনেকটা কৌতূহলে মামার দিকে তাকিয়ে বললো...
বলো, তারপর? কি হলো...পাশ করল ভেলু?

মামা রুবাইকে দেখে একবার হেসে নিলো...
আচ্ছা, পরেরটুকু কাল বলব। এখন ঘুমো। আমি একটু উঠি...

মা তখন অন্য ঘরে, ডাকলেও আসবেনা... তাই অর্ধেকটা গল্প নিয়ে সেদিন রুবাই ঘুমিয়ে পড়ল।
কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই বাকিটা শোনার জন্য উশখুশ, আর মামা তখন কিছুতেই এগোচ্ছে না গল্পে... কিন্তু শেষ পরীক্ষায় ভেলু পাশ করল না ফেল সেটা ওর জানা চাই।
আজও তাই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার শেষে অর্ধেক গল্পটা শুরু হলো। তবে এবার মামা না, মামি বলতে শুরু করল।
-বুঝলে রুবাই, তারপর সেই ছেলেটা খুব ভালো হয়ে গেল। মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল।

রুবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মামির দিকে।
মামি একটানা বলে গেল - ভোর ভোর উঠে কেমন নোটস গুছিয়ে ভেলু পড়াশোনা করত, দেওয়ালে দেওয়ালে থাকত ফর্মুলা আর আরো ভালো করে অঙ্ক বুঝতে পিন্টুদা ওকে নিজের বাড়িতেই ডাকতেন।
এদিকে রুবাইয়ের আর তর সইছিল না...
তারপর?
মামা, ওপাশ থেকে বলল। তারপর আবার কী রে! এত পড়লে পাশ তো করবেই। ভেলুও পাশ করল। শুধু সেই বার নয়, প্রত্যেক বার। তারপর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে আজ একটা বড় চাকরি করছে।

রুবাইয়ের কৌতূহলী দৃষ্টি আবার মামার দিকে ঘুরে গেল...

-তুমি চিনতে ভেলুকে? আর স্কুলের সেই ভালো মেয়েটা...পরে কথা বলেছিল ওরা...বন্ধু হয়েছিল দুজন?
রুবাইয়ের এই প্রশ্ন দুটোতে ঘরময় খুশি ছড়িয়ে গেল...
মামা পাশ থেকে বলল,
সেই ভেলু তো আমি রে রুবাই। আর সেদিনের স্কুলে ওই মস্ত পড়ুয়া মেয়েটি তোর মামি, যে এখনও আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছে...

ঝর্না বিশ্বাস – জন্ম ও পড়াশোনা কলকাতায়। গণিতে স্নাতকোত্তর। পেশা শিক্ষকতা। মুম্বাই প্রবাসী। ভালোবাসি বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি কবিতা পড়তে। ভালোবাসি লিখতে ও অনুবাদ করতেও। প্রকাশিত ই-বুক : "ঋতুযান পাবলিকেশন" থেকে অক্টোবর ২০২০তে প্রকাশিত এলিয়ানোর এচ পোর্টারের 'পলিয়ানা' উপন্যাসের অনুবাদ।অ্যামাজন ও গুগল প্লে স্টোর-এ

বৃত্ত

সুদীপ সরকার

প্রায়ান্ধকারে এখন আর চারপাশের কিছুই চোখে পড়ছে না। বান্দু নদীর অবিরাম ধারা স্রোতের শব্দ আর ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যের নিস্তব্ধতা যেন একে অপরের পরিপূরক। চিকনা ডুংরি পাহাড়ের গা-বেয়ে ঠাণ্ডা নামছে, উত্তুরে হাওয়ায় শৈত্যের ছোবল শরীরের ভিতর পর্যন্ত কাঁপন ধরাচ্ছে। রিসর্টের লনে ক্যাম্প ফায়ার ঘিরে জবুথবু হয়ে বসেছে রঞ্জন আর ঊর্মি; উল্টো দিকে রাজর্ষি আর সঞ্চিতা।

হাঁটুর ওপর পর্যন্ত প্যান্ট পড়া ছেলেটা বোতল থেকে একটু কেরোসিন ঢেলে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান শিখা। ছেলেটার গায় একটা হাত কাটা সোয়েটার আর মাথায় কান ঢাকা টুপি। এই প্রবল ঠাণ্ডায় ওর খুব কিছু এসে যায় মনে হয় না। ছেলেটির নাম আগেই জেনে নিয়েছিল রঞ্জন। কচ্ছপ যেমন সন্তর্পণে গলা বের করে সামনে তাকায়, সেই ভাবেই চাদর থেকে মুখ বের করে রঞ্জন বলল, "ভাই লক্ষণ, চাট কোথায়? খালি মুখে হুইস্কি খাব কি করে?" আগুনের ঝলকে লক্ষণের মুখটা লাল দেখাচ্ছিল, জিভ কেটে বলল,"ভাজা ট হইঞ্ছে বটে, এই লিয়ে আইসছি স্যার।" ভাজা মানে চিকেন পকৌড়া আর চাট মানে পেয়াজ লঙ্কা কুচি দিয়ে ছোলা-আলু সিদ্ধ, সঙ্গে চিনে বাদাম।

প্রকৃতির কোলে এই রকম নৈসর্গিক পরিবেশে থাকার জায়গা খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে সবাইকে একসাথে জড়ো করার কৃতিত্ব রাজর্ষি আর সঞ্চিতার। কোলকাতায় কাজের ব্যস্ততা আর ইট কাঠের কঠোরতায় হাঁপিয়ে ওঠা রাজর্ষি সঞ্চিতা অনেকদিন ধরেই চাইছিল এইরকম একটা উইকেন্ড আউটিং করতে। বেঙ্গালুরু থেকে রঞ্জন কোলকাতায় মাস খানেকের ছুটিতে আসার সাথে সাথেই সব আয়োজন করে ফেলেছে রাজর্ষি। ওর পিসতুত দাদা পুরুলিয়া হাসপাতালের ডাক্তার, তিনিই সমস্ত যোগাযোগ করে দিয়েছেন।

শীতের মরসুমে অযোধ্যা পাহাড়ের এই দিকে প্রচুর মানুষের ঢল। বামনি ফলস, আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম, পাখি পাহাড়, মুরগুমা ফলস এর আনাচে কানাচে এখন ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির ভিড়। পুরুলিয়ার রুখাশুখা টার জমিও যে পর্যটনের নিরিখে মানুষের পছন্দের জায়গা হয়ে উঠতে পারে সেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেভাবে আম বাঙালির ধারনার বাইরেই ছিল। শীতের সময় ছাড়াও ফাল্গুনে দোল যাত্রার সময়টাতেও এখন শহরের ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ ভিড় করে অযোধ্যা পাহাড়ে। রাস্তার ধারে ধারে অযত্নে দাড়িয়ে থাকা পলাশের গাছে গাছে তখন আগুন লাগে, পাহাড় ঘিরে আনমনে চলে যাওয়া চড়াই উৎরাই রাস্তার দু-পাশের জঙ্গলে ফাগের নেশা ধরানো হাতছানি; আদিবাসী গ্রামের মদ্দ জোয়ানেরা মহুয়ার নেশায় মাতাল হয়ে ভালোবাসার নারীকে নিয়ে মেতে ওঠে; ধামসা মাদলের তালে তালে দোলা লাগে গাছে গাছে, শাল পিয়ালের জঙ্গলে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে বাঁশির তীক্ষ্ণ সুরের মত শব্দের মূর্ছনা।

কেয়ারি করা কাচের গ্লাসে চুমুক দিল ঊর্মি, হুইস্কি খেলে ওর মাথা ধরে যায়, একটু ডাইলিউট করে জিন নিলে অসুবিধা হয় না। আবছায়ায় চিকনা ডুংরি পাহাড়টা এখন আর দেখা যাচ্ছে না, একতাল গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আছে সব কিছু। ঊর্মি গ্লাসটা নামিয়ে বলল, "শহরে বসে ভাবাই যায় না পৃথিবীতে এরকম জায়গাও আছে, কি অসাধারণ না?" রঞ্জন একটা চিকেন পকৌড়া মুখে পুরে বলল, "ইয়েস, জাস্ট ফিল দা সিরিনিটি। অল ক্রেডিট গোস টু রাজর্ষি অ্যান্ড সঞ্চিতা। তোরা অরগানাইজ না করলে হতই না।" সঞ্চিতা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "কত দিন পর আমরা আবার বসলাম বল! সত্যি, জায়গাটা কিন্তু অ-সাম। মিসিং ঝিলম, রে।"

ঊর্মি জানে, প্রায় সতেরো বছর পর আবার জড়ো হয়েছে রঞ্জন, রাজর্ষি আর সঞ্চিতা। ঝিলমের কথা শুনেছে ও, কিন্তু সেই মেয়ে যে কোথায় উধাও হয়েছে সেই খবর বাকিদের কাছে নেই। রঞ্জনের কাছে যেটুকু শুনেছে, ঝিলম চাকরি নিয়ে বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিল, তারপর আর কখনো যোগাযোগ রাখেনি বাকি তিন বন্ধুর সঙ্গে। অনেক চেষ্টা করেও নাকি তার খোঁজ পায়নি ওরা। ঝিলমের ফোন নম্বর পর্যন্ত নেই ওদের কারুর কাছে। ফেসবুক এও নেই যে যোগাযোগ করা যাবে।

যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় থেকেই ওরা একেবারে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সিনেমা দেখতে যাওয়া, বাইরে খেতে যাওয়া, ছোটখাটো আউটিং থেকে ইডেনে ভারত –পাকিস্তান ম্যাচ, সব কিছুই একসাথে। মেকানিকালের অন্য ছেলেমেয়েরা ওদের মজা করে বলত চারমূর্তি। চারজনের মধ্যে সব থেকে হইচই করা আমুদে ছিল ঝিলমই। মূলত ঝিলমের উৎসাহেই ওরা চার বছরে চার চারটে লিটল ম্যাগাজিন পর্যন্ত বের করেছিল। সে কি উদ্দীপনা, লেখা সংগ্রহ করা, দরকার মত এডিট করে নেওয়া, প্রচ্ছদ সাজিয়ে ম্যাগাজিনটি কিভাবে আরও ঝকঝকে করে তোলা যায়, সেসব একা হাতে সামলাতে গিয়ে প্রথম সেমিস্টারে রেজাল্ট কিছুটা খারাপও করেছিল ঝিলম। প্রথম বছরে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের নাম ওরা দিয়েছিল "চার"; দ্বিতীয় বছরে চতুষ্কোণ, তৃতীয় বছরে "চার দেওয়াল" আর শেষ বছরে "চারে চার"।

বন্ধুত্ব থেকে উত্তরণের পথে হেটে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে রাজর্ষি আর সঞ্চিতা। রঞ্জন চলে গিয়েছিল বিদেশে। চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রঞ্জন ঝিলমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে ছিল। কোলকাতায় থেকে চাকরি করার ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত ছিল ঝিলম কিন্তু মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানির চাকরি নিয়ে বিদেশে পারি দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি রঞ্জন। তারপর নাকি ঝিলমও চাকরি নিয়ে কোলকাতা ছেড়েছিল। সেই থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা। বছর দশেক বার্লিন আমস্টারডাম ঘুরে আপাতত বেঙ্গালুরুতে থিতু হয়েছে রঞ্জন। বার্লিনে থাকতেই ঊর্মির সঙ্গে পরিচয়, তারপর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে শুভ পরিণয়।

ঊর্মিরা প্রবাসী বাঙালি, তিন পুরুষ ইন্দোরে। ঊর্মির বাবা ডাক্তার, একমাত্র মেয়ের সমস্ত আব্দার মেটানোর ক্ষমতা থাকলেও এক জায়গায় এসে থমকে গেছেন তিনি। বিদেশের মাটিতে আধুনিকতম চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে রঞ্জন। শত চেষ্টাতেও ঊর্মির কোল খালি থেকে গেছে। ডাক্তার বাবুরা বলেন আন-এক্সপ্লেন্ড ইনফারটিলিটি। জগতে কত কিছুই তো আন এক্সপ্লেন্ড রয়ে গেছে। মানুষের সাধ্যের অতীত কিছু নেই যারা বলে, তারা আসলে অর্ধ সত্য জানে। একটা সময় ছিল যখন রঞ্জন নিজের বিদ্যা বুদ্ধির জোরে সব কিছু জয় করতে পারে বলে ভাবত, বিজ্ঞান আর আধুনিক প্রযুক্তির মিশেলে মানুষ

অদম্য বলে মনে করত। নিজের যোগ্যতায় একজন মানুষের যা কিছু পাওয়া সম্ভব, সে সবই ও আয়ত্ত করেছে অনায়াসেই। কিন্তু জীবন থেকে এই এক অদ্ভুত শূন্যতা মুছে ফেলতে পারেনি। ঈশ্বর সবার জন্য বোধহয় সব কিছু বরাদ্দ করেন না। এই উপলব্ধিও জীবন থেকেই হয়েছে রঞ্জনের।

রঞ্জন কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে ইশারায় থামিয়ে রাজর্ষি বলল, "বাট আই হ্যাভ সামথিং টু সে এবাউট ঝিলম। সামথিং এবাউট হার হয়ার এবাউটস।" রঞ্জন বিষম খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল, উদাস দৃষ্টি বান্দু নদীর সীমানা ছাড়িয়ে কাছের পাহাড়ের দিকে চলে গেল কোথাও, দিক ভ্রান্ত বন্য প্রাণীর মত। হুইস্কির কিক নিতে অভ্যস্ত রঞ্জন একটা সিগারেট ধরাল ক্যাম্প ফায়ারের আগুন থেকে। কান খারা করে শুনতে চেষ্টা করল রাজর্ষির কথা। গলা খাঁকারি দিয়ে রাজর্ষি বলল, "সপ্তাহ দুয়েক আগে একবার দিল্লি গিয়েছিলাম কনফারেন্সে। আমাদের কোম্পানির নতুন প্রজেক্টের ব্যাপারে পার্টনার কোম্পানির এমডি দের সঙ্গে হাই প্রোফাইল মিটিং বলা যায়। সেখানে দেখা হোল পাগলিটার সাথে। ঝিলম অলমোস্ট এক রকম আছে জানিস! একটু রাশ ভারি হয়েছে শুধু। সেটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু সেই উচ্ছল দুটো চোখ, সেই অমলিন হাসি মেয়েটাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আমি তো জাস্ট বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। খুব একহাত নিলাম ওকে, কোন যোগাযোগ নেই, আমাদের একদম ভুলে গেছিস, আমরা তোকে কত খুঁজেছি, তুই একটা পাজি, বাঁদর কি না বললাম। ও শুধু হেসেই গেল, একটুও রাগ করল না। অনেক খোঁচানোর পর বলল, এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে পনেরো বছরের মেয়েকে নিয়ে। সিলিকন ভ্যালি তে ওর কোম্পানি। মেয়ের নাম রেখেছে তিস্তা। বাবা মারা যাবার পর কোলকাতার ফ্ল্যাট বাড়ি বিক্রি করে মা কে নিয়ে চলে গেছে নিজের কাছে। ওখান থেকেই ফোনে সঞ্চিতার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিলাম।"

"আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম ওর গলা শুনে, কি যে ভালো লাগছিল, বলে বোঝাতে পারব না। কত কথা বলার ছিল, কত কিছু, পাঁচ মিনিটে সেসব কিছুই বলা হল না। "আফসোস করল সঞ্চিতা।
গ্লাসে চুমুক দিয়ে অবশিষ্ট হুইস্কি মুখে ঢালল রঞ্জন, মুখ বিকৃত করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। গলা থেকে বুকের ভিতর পর্যন্ত জ্বলে গেল ঝাঁজের চোটে। খানিক আনমনে জিজ্ঞেস করল, "ফোন নাম্বার দিল? ঠিকানা? "শাল দিয়ে ভালো করে মাথা মুখ ঢেকে নিয়ে রাজর্ষি বলল, "সে সব বলতে চাইল না, নাম্বার যদিও আমি ওর কোম্পানির কন্টাক্ট পারসেনের থেকে কালেক্ট করেছি। কিন্তু সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা জানলাম সেটা হোল, শি ইস এ সিঙ্গেল মাদার। জানিনা, এটাই কারুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রাখার কারণ কি না। কেন কারুর সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনি জিজ্ঞেস করলাম অনেক বার, হেসে উড়িয়ে দিল, কিছু বলতে চাইল না। কনফারেন্সের শেষে ওর সাথে আর দেখা হয়নি, খোঁজ করে জানলাম, সবার আগেই চেক আউট করে বেরিয়ে গেছে ঝিলম। "

রঞ্জন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল নিজের মনে, এই নিস্তব্ধতা, এই নৈসর্গিক পরিবেশ, পুরনো বন্ধুদের সাহচর্য বা হুইস্কির নেশা, কিছুই যেন ছুঁতে পারছে না ওকে, মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা, যেদিন শেষ বার দেখা হয়েছিল ঝিলমের সাথে, ওদের হেদুয়ার ফ্ল্যাটে। ঝিলম সেদিন একা ছিল ফ্ল্যাটে, বাবা মা জেঠুমনির ছেলের বিয়েতে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিল। পরের দিন একটা ইন্টারভিউ ছিল বলে থেকে গিয়েছিল ঝিলম। ঠিক ছিল, বৌভাতে চলে যাবে একদিন পর। রঞ্জন মাঝে মাঝেই আসত ওদের

ফ্ল্যাটে। সেদিন ঝিলম একা থাকায় ফিরে আসতে চেয়েছিল ও কিন্তু ঝিলম বলেছিল দুপুরে লাঞ্চ করে যেতে। নিজের হাতে রান্না করেছিল শখ করে। খাওয়াদাওয়ার পর দুজনের অনেক কথা হয়েছিল। কথার জালে জড়িয়ে পড়তে পড়তেই কোন এক মুহূর্তে ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের দাপটে দুকূল ভেসে গিয়েছিল ঝিলমের, খড় কুটোর মত উড়ে গিয়েছিল রঞ্জন। ঝড় থামার পর রঞ্জন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেনি, চলে এসেছিল বিধ্বস্ত ঝিলমকে একা রেখে। রঞ্জন ভয় পেয়েছিল, ঝিলমের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মত মনের জোর ছিল না। হয়ত ঝিলম নিজেও ভয় পেয়েছিল। কেউ আর কারুর সাথে যোগাযোগ করেনি। মাস দেড়েক পরেই রঞ্জন পারি দিল বার্লিন। রঞ্জন জানেনা ঝিলম ওর খোঁজ করেছিল কি না কখনো। নিজের ক্যারিয়ার, নতুন চাকরি তারপর ঊর্মিকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন, এসব নিয়ে মেতে উঠেছিল, ঝিলম থেকে গিয়েছিল অতীতেই, মাটি চাপা প্রস্তর যুগের প্রাচীন সভ্যতার মত।

মাথা ভারি হয়ে আসছিল রঞ্জনের, আজকাল চার পাঁচ পেগ নেওয়ার পরেই মাথা ধরে আসে। রঞ্জন উঠে দাঁড়াল, পা টা একটু টলে গেল, অন্ধকারে কেউ ঠাহর করল না। ঊর্মি গুন গুন করে গাইছিল, "আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে, আছ তুমি, হৃদয় জুরে...।" ঘাড় ঘুরিয়ে মাথা তুলে ওপর দিকে তাকাল রঞ্জন, তারায় তারায় ভরা রাতের আকাশ দেখলে নেশা লাগে চোখে, মহা-জগতের বিশালতায় মনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা মুছে যায়। এক অপার্থিব ভালো লাগায় ভরে উঠল মন। নিজের মনে চিৎকার করে উঠল রঞ্জন, "হ্যাঁ, তিস্তা তো আমারই সন্তান। কেউ জানুক আর না জানুক, আমিই ওর পিতা।" রঞ্জন জানে ওকে একদিন গিয়ে দাড়াতেই হবে ঝিলমের সামনে, তিস্তার সামনে, বৃত্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সতেরো বছর আগের কোন এক নির্জন দুপুরে ওঠা ঝড়টা থামবে না কিছুতেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো রঞ্জনের; চিকনা ডুংরি পাহাড়ের দিক থেকে একটা নাম না জানা পাখি শিস দিয়ে উঠল; ঊর্মি মিষ্টি করে গাইছে, "তেমনি তোমার নীবিড় চলা, মরমের মূল পথ ধরে...।"

সুদীপ সরকার, যুগ্ম সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
সেন্ট জেভিয়ারস স্কুল এবং রহরা রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সরকারি চাকরিতে (রাজ্য সরকারি সিভিল সারভেন্ট) আসার পরে লেখালিখির শুরু। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, সানন্দা ওয়েব মাগ্যাজিন, পরবাস ওয়েবজিন, নবকল্লোল এবং নানা পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত।

তোতা-কাহিনী (কবিগুরুর 'তোতা-কাহিনী' র নাট্যরূপ)

স্বরূপ মণ্ডল

নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে গান শোনা যায়। পর্দার বাইরে পাখির মুখোশ পরিহিত একটি ছেলেকে গানের তালে তালে নাচতে দ্যাখা যায়।

‘হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে-
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে ।।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধনহারা,
বাদল-বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে ।।
হারে রে রে রে রে, আমায় রাখবে ধরে কে রে-
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে ।।’

গান শেষ হয়। ছেলেটি মঞ্চ ত্যাগ করে। রাজসভা শুভারম্ভের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। পর্দা সরতেই দেখা যায় রাজসভা। রাজাকে চিন্তিত এবং রাগান্বিত দেখাচ্ছে। সিংহাসনের সামনে আড়াআড়িভাবে পায়চারি করছেন। অন্যান্য সভাসদরাও ভীত-সন্ত্রস্ত। বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক কী হয়েছে। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। সব মিলিয়ে বেশ একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ।

রাজাঃ না না, এ কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না! রাজ্যে কি কায়দাকানুন কিছুই থাকতে নাই? যার যা খুশি করলেই হল?
মহামন্ত্রীঃ কার এমন স্পর্ধা মহারাজ যে আপনার রাজ্যে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। তার কি প্রাণের মায়াটুকুও নেই?
বিদূষকঃ মরণ-পাখা!
রাজপণ্ডিতঃ মহারাজ, ব্যাপারটা যদি খোলসা করে বলেন?
মহামন্ত্রীঃ আমরা থাকতে মহারাজকে এমন চিন্তিত দেখতে হবে! অবশ্যই এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, কি বলেন?
সভাসদগণঃ ঠিকই তো! মহারাজ, বলুন কে আপনার শান্তিভঙ্গ করলে?
রাজাঃ সময়-অসময় জ্ঞান নাই, যখন খুশি গান গাইলেই হল? আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না? তাছাড়া, ফলের বাগানগুলোতে পর্যন্ত ঢুকে ইচ্ছেমতো ফল খেয়ে যাচ্ছে! রাজহাটে যে ফলের বাজারে লোকসান হচ্ছে, সেদিকে কারও হুঁশ আছে?

সকলেই খুব মনোযোগ দিয়ে রাজার কথা শুনছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না। একে অপরের দিকে তাকাচ্ছেন। ভাবখানা এমন, কার এমন বুকের পাটা হল!

সেনাপতিঃ মহারাজ, আপনি কি স্বচক্ষে দেখেছেন তাকে? তবে হুকুম করুন, ব্যাটাকে সমুচিত শিক্ষা দিই।

রাজাঃ আহাম্মুক! সে তো একটা পাখি!

বিদূষকঃ পাখি ফুড়ুৎ!

মহামন্ত্রীঃ তাতে কী? পাখিকে কি ধরা যায় না, না তাকে পোষ মানানো যায় না? মহারাজ, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এই দুনিয়ায় এমন কেউ কি আছে যে পোষ মানবে না?

রাজপণ্ডিতঃ তা তো বটেই! ও তো আকাট মূর্খ! তাই এমন গর্হিত কাজ করেছে, মহারাজ।

রাজাঃ তবে আর অপেক্ষা কীসের? দ্যাখো, ওর অবিদ্যার কারণ কী? ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

মহামন্ত্রীঃ ওকে শিক্ষা দেবার জন্য আপনার ভাগনেই তো আছেন, মহারাজ; আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আপনার শিক্ষামন্ত্রী! আমাদের গর্ব! [মহারাজের ভাগনে হরিহর আহ্লাদে গদগদ হন।]

রাজপণ্ডিতঃ মহারাজ, আমার মনে হয় সামান্য খড়কুটো দিয়ে পাখিটা যে বাসা বাঁধে তাতে বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটা ভাল খাঁচা।

সভাসদগণঃ ঠিক বলেছেন।

রাজাঃ বেশ, তবে তাই হোক। মহামন্ত্রী, রাজ্যের সবচেয়ে ভাল কারিগরকে খবর পাঠাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাঁচা বানানোর ব্যবস্থা কর।

বিদূষকঃ শুভস্য শীঘ্রম!

মহামন্ত্রীঃ মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, মহারাজ। আমি এক্ষুনি লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

রাজাঃ আর হ্যাঁ, সেনাপতি, যত শীঘ্র সম্ভব পাখিটাকে ধরার ব্যবস্থা কর।

সেনাপতিঃ জো হুকুম, মহারাজ।

রাজাঃ এই যে হরিহর, তোমার উপর পাখিটার শিক্ষার সমস্ত ভার ন্যস্ত করলাম। আজ থেকেই তুমি কাজে লেগে পড়। দেখো, যেন শিক্ষায় কোনোরকম খামতি না থাকে।

হরিহরঃ শিক্ষার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। কত বেআক্কেল, বেয়াদপকে সিধা করলাম আর ও তো সামান্য পাখি! মাসকয়েকের মধ্যেই ওকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করে তুলব।

সভাসদগণঃ সাধু! সাধু!

[আলো নেভে।]

আলো জ্বলতেই বল্লম হাতে প্রথম এবং শেষে দু'জন কোতোয়াল এবং মাঝে যথাক্রমে হরিহর, কারিগর এবং ছ'জন ছেলে সারিবদ্ধভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে। সমগ্র মঞ্চটি একবার পাক মেরে কোতোয়াল দ্বয় বল্লম হাতে দ্বাররক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। হরিহর তদারকি করতে থাকেন। নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে যন্ত্র সহযোগে আবৃত্তি হতে থাকে। তালে তালে কারিগর ছেলেদের বিশেষ কায়দায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে খাঁচা বানাতে থাকে।

'কী আয়োজন! দ্যাখো, কী আয়োজন!
কারিগর বাঁধে ঘর, আশু প্রয়োজন।
কী আয়োজন! দ্যাখো, কী আয়োজন!

বেয়াদপ পাখিটারে পরাবে বাঁধন।
কী আয়োজন! দ্যাখো, কী আয়োজন!
বেয়াদপ পাখিটার হবে যে শিখন!!'...

ধীরে ধীরে আওয়াজ অস্পষ্ট হয়। কারিগর কাজ শেষ করে হরিহরের কাছ থেকে পারিতোষিক নিয়ে বিদায় নেয়। হরিহর খাঁচার চারদিক ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। দু'জন রাজপেয়াদা পাখিটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে খাঁচায় পূরে দেয় এবং হরিহরের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করে। পাখিটা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে এবং খাঁচার ফাঁক-ফোকর দিয়ে মুখ বের করে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে দু'জন পথচারী হেঁটে যায়। ওদের খাঁচার দিকে চোখ পড়ে এবং নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে।

প্রথম জনঃ শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!
দ্বিতীয় জনঃ শিক্ষা হোক না হোক, খাঁচা তো হল!
প্রথম জনঃ পাখির কী কপাল!

কথা বলতে বলতে দু'জনে প্রস্থান করে। অপরদিক থেকে পুঁথি বগলে টিকি ধারী রাজপণ্ডিত নামাবলী গায়ে হাজির হন। হরিহর রাজপণ্ডিতকে স্বাগত জানান। পাখিটা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে আর খাঁচা ধরে টান দেয়। পণ্ডিত, পাখিটাকে ভাল করে পরোখ করতে থাকেন আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে মাথা নাড়েন।

রাজপণ্ডিতঃ উঁহু, এ অল্প পুঁথির কম্ম নয়!
হরিহরঃ পুঁথির জন্য আপনি চিন্তা করবেন না, মহোদয়। আমি এক্ষুনি পুঁথি লেখকদের তলব করছি।
রাজপণ্ডিতঃ ঠিক আছে তবে। আপনি পুঁথির ব্যবস্থা করুন, আমি পরে আসব ক্ষণ। [শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে রাজপণ্ডিত প্রস্থান করেন।]

হরিহরঃ ওরে, কে কোথায় আছিস?
সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় একজন রাজপেয়াদা।
রাজপেয়াদাঃ আজ্ঞে, হুকুম করুন মন্ত্রী মশায়।
হরিহরঃ এক্ষুনি পুঁথি লেখকদের খবর দে আর ওই বেয়াদপ পাখিটা খাঁচার কোনো ক্ষতি করল কিনা দ্যাখ।
রাজপেয়াদাঃ জো হুকুম, মন্ত্রী মশায়।

রাজপেয়াদা খাঁচা পরীক্ষা করতে যায়। হরিহরের স্বগতোক্তি ঢেক ঢেক পাখি দেখেছি, এমন বেয়াদপ পাখি বাপের জন্মেও দেখিনি। সাধে কি মহারাজ এত খাপ্পা হয়েছেন পাখিটার ওপর! [হরিহরের প্রস্থান]

আলোর ফোকাস পড়ে খাঁচাটার উপর। দ্যাখা যায় পাখিটা খাঁচার মধ্যে মনমরা হয়ে চুপটি করে বসে আছে। দু'জন পথচারী হেঁটে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে।

প্রথম জনঃ কী উন্নতিটাই না হচ্ছে! দেখে তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়, কী বল?

দ্বিতীয় জনঃ এই না হলে গোপালগঞ্জের মহারাজা! যা বলেন, তা করেই ছাড়েন!

নিন্দুক (নেপথ্যে:) খাঁচাটার তো খুব দেখভাল হচ্ছে, কই পাখিটার তো কোনো উন্নতি দেখছি না?
দ্বিতীয় জনঃ কে? কে বললে? তাই তো বটে! পাখিটার তো কোনো উন্নতি দেখছি না!
প্রথম জনঃ চল, রাজামশায়কে খবরটা দিই।
পথচারীদের প্রস্থান। মঞ্চের এককোণে মহারাজ আর হরিহরের প্রবেশ। আলো-আঁধারি মঞ্চ। আলোর ফোকাস পড়ে দু'জনের ওপর।
রাজাঃ হরিহর, এ কী কথা শুনি?
হরিহরঃ কী কথা, মহারাজ?
রাজাঃ এই, তোমরা নাকি খাঁচার উন্নতিসাধনেই বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। পাখির শিক্ষার ব্যাপারে কোনো ধ্যান নাই।
হরিহরঃ ডাহা মিথ্যা মহারাজ! এই সব নিন্দুকদের কাজ। নিজেদের পকেট পুরছে না তো, তাই মিথ্যা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের কথায় কান দেবেন না, মহারাজ। বিশ্বাস না হয়, ডাকুন কারিগর আর রাজপণ্ডিতকে।
রাজাঃ ও, এই ব্যাপার! বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। দেখো, শিক্ষার কোনো ত্রুটি রেখো না। [গলার থেকে মতির হার খুলে পরিয়ে দেন হরিহরের গলায়।]
হরিহরঃ মহারাজের জয় হোক! চরম আনুগত্যে নতমস্তকে প্রণাম করে প্রস্থান করেন।
[আলো নেভে।]

আলো জ্বলতেই হরিহর, রাজপণ্ডিত এবং পুঁথি বগলে দু'জন রাজপেয়াদা মঞ্চে প্রবেশ করে। পুঁথিপত্র খাঁচার সামনে নামিয়ে রেখে একজন পিছন থেকে পাখিটার গলা ধরে অপরজন পাখির সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজপণ্ডিত একটা করে কাগজ ছেঁড়েন আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে রাজপেয়াদার হাতে দেন। রাজপেয়াদা সেইসব ছেঁড়া পুঁথিগুলো ঠেলে ঠেলে পাখিটার মুখে গুঁজে দেয়। পাখিটার আওয়াজ করবার জোটুকু নাই, শুধুই ছট্‌ফট্ করতে থাকে। হরিহর দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ নেন। কোতোয়াল দ্বয় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দ্বার পাহারা দেয়। মহারাজের আগমন বার্তা দেয় কোতোয়াল দ্বয়। মহারাজ এবং তাঁর অমাত্য দ্বয় বিদূষক ও মহামন্ত্রী প্রবেশ করেন।

কোতোয়ালদ্বয়ঃ গোপালগঞ্জের মহারাজ শ্রী শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং মহামন্ত্রী পদার্পণ করছেন.....

অমনি শাঁখ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল বেজে ওঠে। রাজপণ্ডিত আরও জোরে মন্ত্রপাঠ শুরু করেন। হরিহর জয়ধ্বনি দেয়।

হরিহরঃ মহারাজ, কাণ্ডটা দেখছেন?
রাজাঃ এ যে দারুণ ব্যাপার! দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ওহ্, কী আওয়াজ!
হরিহরঃ শুধু আওয়াজ নয় মহারাজ, এর পিছনে অর্থও আছে যথেষ্ট।
মহামন্ত্রীঃ সে কী আর বলবার কথা! এ তো আয়োজন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কী বলেন মহারাজ?
রাজাঃ এই না হলে আমার ভাগনে! বেশ, বেশ চালিয়ে যাও। আরও কিছু প্রয়োজন হলে বলতে দ্বিধা কোরো না কিন্তু?
মহারাজ এবং তাঁর অমাত্য দ্বয় প্রস্থানে উদ্যত হন। এমন সময় নেপথ্যে নিন্দুক বলে ওঠে, মহারাজ পাখিটাকে দেখেছেন কি?
[মহারাজের চমক লাগে।]
রাজাঃ ওই যা! একেবারে ভুলেই গেছিলাম। পাখিটাকে তো দেখা হল না?
ফিরে এসে রাজপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন।

পণ্ডিত, পাখিকে শিক্ষা দেবার কৌশলটা একবার দেখাও দেখি?

রাজপণ্ডিত ফাঁপরে পড়েন কিন্তু দমে না গিয়ে সবিনয়ে রাজাকে খাঁচার কাছে নিয়ে যান। মহারাজ খাঁচাটা ভাল করে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসেন এবং যাবার সময় রাজপেয়াদাকে ডাকেন। অমনি রাজপেয়াদা হাজির হয়।
রাজাঃ যেখান থেকে পার ওই নিন্দুকদের খুঁজে বের করে আচ্ছা করে ঘা কয়েক লাগিয়ে দেবে, বুঝলে?
রাজপেয়াদাঃ জো হুকুম, মহারাজ।
রাজা ও মহামন্ত্রী প্রস্থান করেন। আলো কমে আসে। নেপথ্যে একটা করুণ সুর ভেসে আসে।
'দূরে কোথায় দূরে দূরে/ আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে'।

একে একে চরিত্ররা মঞ্চ ত্যাগ করে। কোতোয়াল দ্বয় আস্তে আস্তে বসে পড়ে এবং অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে। পাখিটা ধীরে ধীরে চিৎ হয়ে শুয়ে উপরদিকে হাত-পা তুলে দেয়।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলো নেভে। আবার অস্পষ্টভাবে জ্বলে উঠে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দ্যাখা যায় কোতোয়াল দ্বয় তখনও বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। দু'জন পথচারী খাঁচা এবং পাখিটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছে।

প্রথম জনঃ পুঁথিপত্রে তো গিজগিজ করছে, এদিকে পাখিটার নড়নচড়ন কিছুই তো দেখছি না।
দ্বিতীয় জনঃ তবে কী পাখিটা মরে গেল?
প্রথম জনঃ তাই তো মনে হচ্ছে। দানা-পানি কিছুই নাই, শুধুই তো পুঁথি! মুখের মধ্যেও পুঁথি ঠাসা। শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ।
দ্বিতীয় জনঃ চল যাই, রাজামশাইকে খবরটা দিই। [দু'জনেই প্রস্থান করে।]
মঞ্চের এক অংশে মহারাজ এবং হরিহর প্রবেশ করেন। তাঁদের উপর ফোকাস পড়ে। অবশিষ্ট মঞ্চ আলো-আঁধারি।
রাজাঃ হরিহর, এ কী কথা শুনি?
হরিহরঃ নিন্দুকদের কথায় কান দেবেন না, মহারাজ। আসলে পাখিটার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে তো তাই সে অতিশয় শান্ত আর নম্র হয়ে গেছে। কথায় বলে, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।
রাজাঃ হুঁ...! ও কি আর লাফায়?
হরিহরঃ আরে রাম! রাম!
রাজাঃ আর কি ওড়ে?
হরিহরঃ না।
রাজাঃ আর কি গান গায়?
হরিহরঃ না!
রাজাঃ দানাপানি না পেলে আর কি চেঁচায়?
হরিহরঃ একেবারেই না, মহারাজ!

রাজাঃ তাহলে, বেশ ভালই শিক্ষায় দিয়েছ দেখছি। চল তো পাখিটাকে একবার দেখি।
হরিহরঃ চলুন, মহারাজ।
মঞ্চের অপর অংশে ফোকাস পড়ে। হরিহর মহারাজকে নিয়ে প্রবেশকালে হাঁক ছাড়েন।
হরিহরঃ কোতোয়াল.....কোতোয়ালদ্বয় ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে।
কোতোয়ালদ্বয়ঃ আজ্ঞে হুকুম করুন, মন্ত্রীমশায়।

হরিহরঃ পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের কর, রাজামশায় দেখবেন।
কোতোয়ালদ্বয়ঃ আজ্ঞে, এক্ষুনি বের করছি, মন্ত্রীমশায়।
কোতোয়ালদ্বয় খাঁচার দ্বার খুলে পাখিটাকে টেনে হেঁচড়ে বের করে আনে। রাজা পাখিটার কাছে গিয়ে পেট টিপতে থাকেন। কিন্তু পাখিটার মধ্যে কোনোরূপ প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় না। রাজা হরিহরের দিকে তাকিয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসেন। হরিহরও রাজাকে অনুকরণ করেন। মঞ্চে ধীরে ধীরে আলো কমে আসে।
সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি-
‘ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী।।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ,
দিশাহারা মেঘ গেল যে ডাকি।।
নির্মল দুঃখ যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে-
আত্মবিড়ম্বনা দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক থেমে।
দুরাশায় যে মরাবাঁচায় এত দিন ছিলি তোর খাঁচায়,
ধূলিতলে তারে যাবি রাখি ।।’

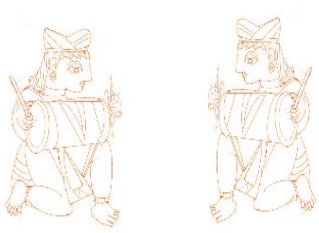

দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসে।
‘দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন গো বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।।’

অবশেষে আলো নেভে।
যবনিকা পতন

স্বরূপ মণ্ডল

জন্ম ১৯৮২ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরে। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘দুন্দুভি’ নামক পত্রিকায় যেটি কান্দি থেকে প্রকাশিত হতো নয়ের দশকে। পরবর্তীতে ‘অঙ্গাঙ্গি’ নামক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শ্রী অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ এবং কবিতা প্রকাশ। এছাড়াও মাধুকরী, পরবাস, তথ্যকেন্দ্র, হাতপাখা, সঙ্গদীপ প্রভৃতিতে কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “প্রতিধ্বনি”।

বাহাত্তর ঘণ্টা

অচিন্ত্য দাস

রাখালহরি স্ট্রীটের এগারো নম্বর বাড়িটা এখন এগারোর একের এ, একের বি এভাবে ভাগ হয়ে গেছে। তবে শ্রীমতী বিদিশা রানি ঘোষালকে সারা পাড়া এগারো নম্বরের মহিলা বলেই জানে। আগে এখানে বাগানটাগান সমেত পৈত্রিক বড় বাড়ি ছিল – অত বড় বাড়ি ঠিক করে রাখা সম্ভব নয়, তাই আজকাল সব জায়গায় যা হচ্ছে তাই হয়েছে। পুরনো বাড়ির জমিতে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে। ঝানু প্রোমোটারবাবু বহু লোককে ঘোল খাইয়েছেন কিন্তু বিদিশা রানির সঙ্গে 'আলোচনা'র পরে ইনি নিজেই এক পেট লস্যি খেয়ে ফিরেছিলেন। বিস্তর ঝগড়া-ঝাঁটি দর-দস্তুর করে সব থেকে ভালো চারটে ফ্ল্যাট নিজেদের জন্য করে নিয়েছিলেন বিদিশা রানি।

ওনার স্বামী রবিকিরণ ঘোষালের অবশ্য অতটা নামডাক নেই। শান্ত স্বভাবের মানুষ তো। সরকারি চাকরি করতেন – অবসর নিয়েছেন আজ পনেরো বছর হয়ে গেল। ধর্মপত্নীর 'তত্ত্বাবধানে' সুবোধ ভদ্রলোকটি ভালই আছেন। তিন পুত্র এঁদের – বিদিশা রানি তিনজনকে তিনটে ফ্ল্যাট দিয়েছেন আর একটায় এনারা দুজন থাকেন। চমৎকার ব্যবস্থা। মানে ছেলে-ছেলেবৌ-নাতি-নাতনিরা একসঙ্গে না থেকেও একসঙ্গেই আছে। কিছু হলে এক ডাকে পাওয়া যায়। 'ডাক' দেওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা আর একটু নতুন ধরনেরও বটে।

বিদিশা রানির কথায় পাড়ার ফোন মিস্ত্রি দুলুকে খবর দেওয়া হয়েছিল। বিদিশা রানি বললেন, "চারটে ফোন লাগাবে, আমার একটা আর তিন ছেলের তিনটে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দরকার পড়লে যেন ডাকতে পারি। বাইরের জন্য নয়।"

এক গাল হেসে দুলু বলল, "জানি জেঠিমা, একে বলে 'ইন্টার কম'। দুদিনে লাগিয়ে দেব ..."

চার ফ্ল্যাটে চারটে ইন্টার কম লাগিয়ে দিয়ে মেজো ছেলের ফ্ল্যাট থেকে দুলু ফোন করল, "হ্যালো, জেঠিমা, শুনতে পাচ্ছেন..."

বিদিশা রানি বললেন, "হ্যাঁ, পাচ্ছি। তুমি এসো তো আমার কাছে ..."

জেঠিমার গলার স্বরে দুলুর মনে হলো জেঠিমা কোনো কারণে বেদম রেগে গেছেন। যাই হোক পয়সা তো উনিই মেটাবেন। দুলুকে আসতেই হলো।

ঢুকতেই বিদিশা রানি ফেটে পড়লেন। "কে তোমাকে এতো ওস্তাদি করতে বলেছে. অ্যাঁ..."

দুলু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। মিনমিন করে বলল, "জেঠিমা, সবই তো ঠিক আছে, মানে যেমন বলেছিলেন তেমনই তো করে দিয়েছি ..."

"তেমন করেছো না ছাই! কে তোমায় বলেছিল যে ওদের ফ্ল্যাট থেকে কথা বলা যাবে? কান খুলে শোন – কথা একদিক থেকে হবে, আমি বলব ওরা শুনবে। ব্যাস।"

রবিকিরণ চেঁচামিচি শুনে এসে দাঁড়ালেন। সংকটের মধ্যে যতটা আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করা যায় ততটা করে বললেন "কেন, ঠিকই তো হয়েছে। ফোন তো দুদিক দিয়ে চলে।"

"থামো। দুদিক দিয়ে চলার দরকার নেই। পার্ক ইস্ট্রিটের মত বড় রাস্তাতেও একদিক দিয়েই গাড়ি চলে। দুলু, যা বললাম আজই সেই মতো করে দিয়ে তোমার টাকা নিয়ে বাড়ি যাবে। আর যেন বলতে না হয়"

দুলু আবার খেটেখুটে কিছু তার এদিক ওদিক করে ব্যবস্থা করল।

পয়সা মেটাবার আগে দুলুকে দিয়ে ফোনের তিনটে চাবির ওপর বি, এম আর সি অক্ষরের স্টিকার লাগিয়ে নিলেন। এসব কেন তা জেনে দুলুর কী লাভ? সে পয়সা পেয়ে কেটে পড়ল। রবিকিরণ অনেকক্ষণ দেখেও বুঝতে পারলেন না অক্ষরগুলোর মানে কী। বিদিশা রানি রবিকিরণের বুদ্ধি নিয়ে দু-একটা চোখাচোখা মন্তব্য করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বি, এম, সি মানে বড়, মেজো, ছোট।

এসব নিয়ে দিনকাল ভালোই চলছিল এমন সময় একদিন সকালে বিদিশা রানির হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল। প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন। ভাগ্যিস রবিকিরণ ধরে ফেলেছিলেন, নয়ত নির্ঘাত পা কিংবা কোমর ভাঙ্গত। বি, এম, সি তিনটে চাবিই টেপা হলো। হৈচৈ পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে পাড়ার বোস ডাক্তারকে পাওয়া গেল, তখনো হাসপাতালে যান নি। বাড়িতে এলেন – দেখে বললেন, "মনে হচ্ছে মাথায় স্ট্রোক হয়েছে। এখুনি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, আমি লিখে দিচ্ছি।"

এম-আর-আই আর নানারকম টেস্ট করে দেখা গেল খুব হালকা স্ট্রোকের সঙ্গে সোডিয়াম-পটাশিয়ম বিগড়ে যাওয়ায় এরকম হয়েছে। ভয় পাবার মতো কিছু নয়। চার দিনের দিন হাসপাতাল থেকে ছুটিও হয়ে গেল। একগাদা ওষুধ, প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দিয়ে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বললেন "এই সময় মাথার কাজ যেন না করেন। মানসিক চাপ একদম যেন না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। ওনার চিন্তা-ভাবনা কথাবার্তা অবশ্য একটু অসংলগ্ন হতে পারে।"

বাড়ি ফিরলেন বিদিশা রানি।

দেখে বোঝা যাচ্ছে বিদিশা রানি শারীরিক ভাবে ভালো আছেন তবে হাসপাতাল থেকে আসা অবধি তাঁকে চুপচাপ মনে হচ্ছে। কথা বিশেষ বলছেন না। আগে অন্য রকমের ছিলেন তো!

এখন কটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে তাই বারো ঘণ্টার আয়া রাখা হলো। কিন্তু সারাদিন বসে বসে কী করবেন তিনি? হাসপাতাল থেকে আবার বলে দিয়েছে মাথার কাজ যেন না করে! শেষে এক বুদ্ধি বার করলেন রবিকিরণ। এই কদিন আগে গিন্নীকে একটা স্মার্টফোন কিনে দিয়েছেন – তাতে হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুক লাগিয়ে দিলেন। বহু গ্রুপে তিনি আছেন, ফেসবুকেও অনেক ই-বন্ধু। সকালে হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই ডজন খানেক গুড মর্নিং আর সুপ্রভাত পাওয়া যায়। ফেসবুকে কার বাড়িতে পায়রা ডিম দিয়েছে, কে সাঁতরাগাছিতে শালীর বাড়িতে গিয়েছিল গতকাল ... এসব জানা যায়। তাছাড়াও অবশ্য অনেক কিছুই থাকে – তবে সে সব না পড়লেই হলো। ফেসবুকে গিন্নীকে নিজের বন্ধু করে নিলেন আর হোয়াটসঅ্যাপেও বেশ কয়েকটা গ্রুপের সঙ্গে ওনাকে জুড়ে দিলেন। কটাদিন বিদিশা বরং এসব নিয়ে থাকুক। এসব পড়তে মাথার কাজের ব্যাপারটা নেই, এমনকি মাথা না থাকলেও অসুবিধে হবার কথা নয়।

দুপুরের দিকে আয়া হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রবিকিরণকে ডাকতে লাগল "জেঠাবাবু, তাড়াতাড়ি এস ... জেঠিমা কীসব কতা বলছে..."

তড়িঘড়ি গিয়ে দেখেন বিদিশা রানির মুখচোখ কেমন যেন ভাবলেশহীন লাগছে। খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এদিকে ফিরে বললেন, "পরিবার আদর্শ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে একতা থাকতেই হবে।"

এ আবার কী হলো? রবিকিরণ ভাবলেন বড়বৌকে দিয়ে বড়ছেলেকে আপিসে একটা খবর দেওয়া দরকার। যাচ্ছিলেন এমন সময় শুনলেন বিদিশা কিছু বলছে। ওনাকে নয়। আয়াকে বলছেন, "মঙ্গলবারের শুভেচ্ছা। সারাটা দিন ভালো কাটুক।"

বিকেলের দিকে বড়-বৌ এসে প্রোটিন-মিক্স গুলে গেলাসে করে নিয়ে এলো। হাসপাতাল থেকে খাওয়াতে বলেছে। বলকারক পানীয়। দুপুরের ঘুম থেকে উঠে জল ফুটিয়ে বানাতে বানতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। খাটের পাশে টেবিলে গেলাসটা রাখতে যাবে এমন সময় বিদিশা রানি হঠাৎ বলে উঠলেন "অমরত্বের জন্য অমৃত লাগে না, কর্মে নিষ্ঠাই যথেষ্ট।"

গেলাস পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে বড়-বৌ প্রস্থান করল। গতিক একেবারে ভালো নয়। মাথাটা গেছে।

বড়ছেলে একজন নামকরা নিউরোলজিস্টের সঙ্গে ফোনে 'অন-লাইন' কথা বলার ব্যবস্থা করল। অন-লাইন কারণ তাহলে কোথাও কারোকে আর যেতে হয় না, ডাক্তারবাবুও নিজের চেম্বারে বসেই 'অন-লাইন' কথা বলবেন। দক্ষিণাও কার্ড থেকে অনলাইনে হুস করে বিয়োগ হয়ে গেল।

রবিকিরণ সব কিছু জানালেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "উনি কি একটু ধার্মিক স্বভাবের ..."

উত্তর দিতে গিয়ে রবিকিরণ জিভ কামড়ে ফেলেছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "না না সেরকম কিছু নয় ..."

"বিশ্রামে আছেন তো বললেন – কী করছেন বসে বা শুয়ে?"

"কিছু নয়... শুধু ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এসব সারাদিন কুটুর কুটুর করে দেখছেন – কিছু করার নেই তাই ওনার ফোনে আমি ভরে দিয়েছি ..."

"হুঁ। ওষুধ না দিলেও চলবে, তবে একটা ভিটামিনের বড়ি লিখে দিলাম। খাওয়াতে পারেন। ভাববেন না – সেরে যাবে।"

"আপনা থেকে সেরে যাবে?"

"হ্যাঁ, আপনা থেকে। মানুষের মগজ এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্র। নিজেই বুঝে নেয় কী ধরে রাখবে কী রাখবে না। সোডিয়াম-পটাশিয়মের মাত্রা বিগড়ে যাওয়াতে একটু ঘেঁটে গিয়েছে, এই যা।"

"আজ্ঞে, কতদিন লাগতে পারে সারতে ..."

"বাহাত্তর ঘণ্টা"

ঝপ করে কম্পিউটারের পরদা অন্ধকার হয়ে গেল। মানে অন-লাইন সাক্ষাৎ শেষ। ডাক্তারবাবু যা বলার বলে দিয়েছেন।

বড় ডাক্তার আশা দিয়েছেন, সারতে কত সময় লাগতে পারে তাও বলে দিয়েছেন। চিন্তা সে দিক দিয়ে একটু কমলেও রবিকিরণের ভাবনা হয়েছে কাল আয়া আসবে কি না। আজ যাবার সময় বলছিল "জেঠিমা কি পাগল হয়ে গেল!"

রাতের ঘুম ভালো হয়েছিল, রবিকিরণ ভাবলেন গভীর ঘুম হলে তো অনেক অসুখ সেরে যায়। আজ দেখা যাক। ও বাবা, খাটে উঠে বসেই বললেন, "বিশ্বাসই সম্পর্কের আসল ভিত্তি। বিশ্বাস ছাড়া সম্পর্ক টেকে না।"

এই খেয়েছে। এ তো একটুও সারেনি। তেমন ভরসা না থাকলেও একটা ভিটামিন বড়িই খাইয়ে দিলেন।

সেদিনটা যা কাটল! ছোট বউ ছেলেকে ইস্কুল বাসে চড়িয়ে রান্নাঘরের কাজের ফাঁকে হলুদের ছোপ লাগা ম্যাক্সি পরেই একবার শাশুড়িমাতাকে দেখতে এসেছিল। বিদিশা রানি ছোটবউকে বললেন, "বয়স একটি সংখ্যা মাত্র। বেশি বয়সে অনেকে নবীন আবার কম বয়সেই অনেকে বৃদ্ধ।"

ছোট কী বুঝল সেইই জানে। তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল।

সারা বাড়িতে রটে যাওয়ায় আর কেউ দেখতে আসেনি। রবিকিরণ আর আয়া মেয়েটিকেই সব উপদেশ আর বাণী শুনতে হচ্ছে। বিকেলে আয়া বলল, "জেঠাবাবু, আমার ট্যাকাটা দিয়ে দাও, কাল থেকে আসবনি"

"কেন, তোমার আবার কী হলো? আসবে না কেন?"

"রোগীর সেবা করার টেনিং আমার আছে। কত রকমের পেসেন্টের কাজ করেছি। কিন্তু পাগল সামলাতে পারবনি। যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয় ..."

আয়া কাজ ছেড়ে দিল। মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন রবিকিরণ। কী করা যায়? লক্ষণ শুনলে তো হাসপাতাল, নার্সিংহোম কেউ ভর্তি করবে না ... এখন বাহাত্তর ঘণ্টা অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

উফ, কী ভাবে যে দিন কাটছে তা বলার নয়। আয়া চলে গেছে, এদিকে বি, এম, সি টেপাটেপি করে বড় একটা কাজ হচ্ছে না । বৌমারা সাহস পাচ্ছে না আসতে। যা তা। বিদিশা রানির সামনেই নিজেকে নিজে বলে ফেলেছিলেন, "উফ, এই বুড়ো বয়সে কী করে যে সামলাই ..." বিদিশার কোনো দিকেই মন নেই, শুধু ফোন ঘেঁটে চলেছেন। কথাটা শুনে রবিকিরণকে বললেন, "বার্ধক্য জীবনের সেরা সময়। নেই শিশুবয়সের অসহায়তা, নেই যুবকের বেপরোয়া ভাব, নেই মাঝবয়সের কাজের চাপ – আছে কেবল অফুরন্ত সময় ..."

আর সহ্য না হওয়াতে রবিকিরণ বোস ডাক্তারকে ফোন করলেন। সব শুনে তিনি জিগ্যেস করলেন, "নিউরোলজিস্ট কী বলেছেন?"

"মানুষের মগজ নিয়ে কীসব বলছিলেন, ঠিক বুঝলাম না। ভিটামিন ছাড়া ওষুধও দেননি। একটাই কথা জোর দিয়ে বললেন 'বাহাত্তর ঘণ্টা'।"

"ঠিক আছে, কাল হাসপাতালে যাওয়ার পথে একবার দেখে যাব।"

আজ ভোর থেকে রবিকিরণ কেমন যেন টের পাচ্ছিলেন বিদিশা রানির হাবভাবে একটা পরিবর্তন আসছে। সেটা ভালোর দিকে না আরও খারাপের দিকে তা অবশ্য তিনি বুঝতে পারছেন না।

সকালে আটটা নাগাদ ডাক্তারবাবু এলেন। প্রথমে প্রেশারটা মাপলেন তারপর বললেন, "একটা এম-আর-আই করাতে হতে পারে। আচ্ছা হাসপাতালের প্রেসক্রিপশনটা দেখান তো ..."

রবিকিরণ এম টিপলেন। "মেজো বৌ, আলমারির চাবিটা তোমাকে রাখতে দিয়েছিলাম, নিয়ে এস তো..."

ভোর থেকে বিদিশা রানির ভাবগতিকে যে পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল এবার। রবিকিরণের দিকে চোখ পাকিয়ে বিদিশা রানি বললেন, "তোমার আক্কেল কবে হবে! মেজোকে চাবি রাখতে দিয়েছ! মেজোকে দেখে বোঝা যায় না, ভীষণ চালাক মেয়ে..."

এই মহিলাই সেদিন বলছিলেন বিশ্বাসই সম্পর্কের ভিত ... ফোনের পরদা আর সংসার দুটো আলাদা জায়গা।

যাইহোক হাসপাতালের কাগজ বার করে দেওয়া হলো। বিদিশা রানি স্মার্ট ফোনটা সরিয়ে রেখে বললেন, "পুঁটিকে ডাকো তো"

পুঁটি এ ফ্ল্যাটে বাসন ধোয়া কাপড়কাচার কাজ করে। এসে দাঁড়াতেই বিদিশা রানি বললেন, "ব্যালকনিতে চাদরটা যে মেলেছিস, কিলিপ লাগাসনি কেন?"

"অত ভারী চাদর, হাওয়ায় উড়বেনা"

"হাওয়ায় কী ওড়ে কী ওড়ে না তা আমি জানি। ক্লিপ লাগিয়ে দে।"

পুঁটি ক্লিপ লাগাতে লাগাতে ভাবছিল, জেঠিমা কটাদিন অসুখে পড়াতে একটু সুখে ছিল, তাও পট করে শেষ হয়ে গেল। এইজন্যই কথায় বলে – সুখ এসেই পালিয়ে যায় কিন্তু দুঃখের কোনো শেষ নেই!

কাগজপত্র দেখে বোস ডাক্তার একটু তড়িঘড়িই উঠে পড়লেন। বোধহয় পেশেন্টের ভাবগতিক দেখে। রবিকিরণ ডাক্তারের হাতে ফি টা দিতে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে বিদিশা বলে উঠলেন, "পুরনো পেশেন্টের আবার ফি কেন?"

রবিকিরণ তো অপ্রস্তুতের একশেষ। কোনো রকমে টাকাগুলো ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, "এম-আর-আই তো লিখে দিলেন না, কবে নাগাদ করাবো ..."

ডাক্তারবাবু তখন পালাতে পারলে বাঁচেন। গেট দিয়ে বেরোতে বেরোতে রবিকিরণের দিকে না ফিরেই হাত তুলে বললেন, "এমারাই টেমারাই কিচ্ছু দরকার নেই – বুঝতে পারছেন না অসুখ সেরে গেছে। পেশেন্ট একেবারে 'স্বাভাবিক'। সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে পারেন।"

রবিকিরণ ঘরে ঢুকতেই বিদিশা বললেন, "ছোটকে ডাকো। পেতলের সাপমুখো পিলসুজটা মেজে রাখবে।"

পুজোর জিনিসে পুঁটি হাত দেয় না। তাই এই পুণ্যকাজগুলো করে বৌরা প্রায়ই বিনা খরচে পুণ্যার্জন করে।

রবিকিরণ বললেন, "ওটা তো চকচকেই আছে, মাজবে কেন?"

"উফ, যা বলছি করো দেখি। কাজের দরকার না থাকলেও সবাইকে 'হড়কে' রাখতে হয়, নইলে কেউ মানে না। এই সব 'সাধারণ জ্ঞান' ছাড়া কী করে যে সরকারি আপিসে এতদিন চাকরি করলে!"

ছোটবৌ চলে গেলে রবিকিরণ বললেন, "বারবার পালে বাঘ পড়েছে বলে মিথ্যে চেঁচালে যখন সত্যি দরকার হবে তখন ..."

"ওসব কথামালার গল্প আজকাল চলে না। সে বাঘও নেই, সে রাখালও নেই ... হ্যাঁ, টেবিল ঢাকাটা পাল্টে দাও তো..."

"কেন, ওটা তো ভালোই আছে..."

"যা বলছি কর।"

রবিকিরণ বুঝলেন 'হড়কে-রাখা' ফরমুলার প্রয়োগ এবার তাঁর ওপরেই হচ্ছে।

তবু তিনি আজ খুশী। স্মিত হাসি হেসে টেবিলের জিনিসপত্র সরাতে লাগলেন। যাক বাবা! হোয়াটসঅ্যাপ, মানে ভালো বাংলায় 'সামাজিক মাধ্যম' থেকে পাওয়া জ্ঞান আর মণিমুক্তোর মতো বাণীটানী সব মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। বদহজম হয়ে গিয়েছিল – অভ্যাস নেই তো। থেকে থেকে তাই ভালো কথার ঢেকুর উঠছিল। নিউরোলজিস্ট মশায় যা বলেছিলেন তা কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল। মগজের অভিজ্ঞ ডাক্তার তো – সারতে কতটা সময় লাগতে পারে তা একেবারে সঠিক বলে দিয়েছেন। মানুষের মগজে উপদেশমালা বাহাত্তর ঘণ্টার বেশি টেকে না।

অচিন্ত্য দাস

ছোটদের গল্প দিয়ে লেখালিখির শুরু। পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের নিবন্ধ ও গল্প লিখে থাকেন। পঞ্চাশটি স্বল্পদৈর্ঘের ছোটগল্প নিয়ে "তিন পলকের গল্প" নামে একটি বই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর লেখা নিবন্ধ সংকলন "কথার কথা" এবং একাধিক ছোটদের গল্পের বইও আছে। পেশাগত ভাবে ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অবসর নেবার পরে জামশেদপুর শহরে বাস করেন।

হ্যান্ডশেক

চিন্ময় বসু

এক জন মানুষ লাজুক চোখে, হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে আছে, হ্যান্ডশেক করবে। চেনা লাগছে কিন্তু মনে পড়ছে না, কোথায় দেখেছিলাম। এমন অবস্থায় কেউ পারে হাত না বাড়াতে? আমিও পারি নি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুটিও পারে নি।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী হলে থাকি, সময়টা ১৯৭৫ হবে সম্ভবত । আমরা কয়েকজন রিসার্চ করি যারা, তিন তলার এক কোনায়, সারি দিয়ে আমাদের ঘর। হস্টেলের হৈচৈ থেকে একটু আলাদা, ছোট একটা ব্লক । অধিকাংশ ছাত্রই স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ে। কেউ দিল্লী স্কুল অফ ইকোনমিক্সে, কেউ পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন ফ্যাকাল্টিতে, কেউ ল'স্কুলে বা হিউম্যানিটিসের কোনও বিভাগে। সামনে লম্বা করিডোর, এপ্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত। আড়াই ফুট উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে দেখা যায় নিচে রাস্তা, গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে।

সেদিন সকালে বাথরুম থেকে বেরোতেই দেখি, পকেট রাখা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে ছেলেটা। বাথরুমের দেওয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে চমকে উঠেছিল, বুঝতে পারেনি বাথরুমে কেউ আছে। সামলে নিয়ে চুল আঁচড়ানোয় মনো নিবেশ করলো । আমিও একটু আশ্চর্য I ছেলেটির ষণ্ডামার্কা চেহারা, কুস্তিগির ধরনের। উত্তর ভারতে কুস্তি জনপ্রিয়, স্থানীয় কলেজ পড়ুয়াদের অনেকে কুস্তি করে। আমাদের বন্ধু বান্ধবেরা তেমন স্বাস্থ্যবান নয়, অধিকাংশই চোখে চশমা, পড়ুয়া ধরণের দেখতে। খটকা লাগলো, কার কাছে এসেছে?

ঘরে ঢুকতেই চোখ গেল বিছানায়। বই খাতা আর কলম ছেড়ে বাথরুম গিয়েছিলাম। দেখি, নেই কলমটা। ড্রয়ার খুললাম, নতুন মোজা, পুরানো রুমাল আর একটা দশ টাকার নোট ছিল। কোনোটাই নেই। বালিশ উল্টে দেখলাম হাতঘড়িটা আছে। বালিশের তলায় থাকে, তাই রয়ে গেছে। সন্দেহ হলো, সেই চুল আঁচড়ানো ছেলেটা নয়তো?

মন হাহাকার করছিল কলমটার জন্য। মা কিনে দিয়েছিলেন, জন্ম দিনের উপহার। আমার খুব প্রিয়, লেখেও ভারি সুন্দর। সত্তরের দশকে এই ফাউন্টেন পেন খুবই লোকপ্রিয় ছিল। নাম উইংসঙ্গ, উইলসন ইত্যাদি ধরণের। কলমের নিবের মাত্র পাঁচ শতাংশ দেখা যেত, বাকিটা কলমের শরীরেই ঢাকা; রকেটের মত দেখতে। কলমের ঢাকনা সোনালী রঙের, খুবই মনোগ্রাহী I বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলাম এগুলো চীনে তৈরি।

করিডোরে এসে নিচে তাকিয়ে দেখি সেই ছেলেটা হেলতে দুলতে যাচ্ছে, আরও কিছুটা গেলেই হস্টেলের গেট পেরিয়ে যাবে। পেছনে সাইকেলে আমাদের হস্টেলের লন্ড্রীম্যান। সর্দারজীটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক । তিনতলা থেকে চেঁচালাম,

: সর্দারজী, ছেলেটাকে হস্টেলে আসতে বলুন I

সাইকেল থেকে নেমে সর্দারজী ছেলেটাকে কিছু বললেন, ইঙ্গিত করে আমায় দেখালেন। খুবই অমায়িক মানুষ সর্দারজী, কিন্তু ওঁর ব্যক্তিত্ব অগ্রাহ্য করা সহজ নয়, ঘুরে হস্টেলের দিকে ফিরল ছেলেটা I আমি দৌড়লাম সিঁড়ির দিকে, চিৎকার করলাম,

: শান্তনু, শিগগীরই আয়, চোর।

শান্তনু আমার পরের ব্যাচের; কাছেই ওর ঘর, তখনও এম এস সি পড়ে। রোগা পাতলা, খেলোয়াড়ি চেহারা। জুবিলী হলের পোর্টিকোতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। সংক্ষেপে বললাম ঘটনা । ও নিশ্চিত, ওই চুরি করেছে।

ছেলেটা এগিয়ে আসছে। মুখ নির্বিকার, হাঁটার ভঙ্গিমাতে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। নিজের মনেই সন্দেহ হলো, ভুল করছি না তো? কাছে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। আগে দেখা হওয়ার পরিচিতির আভাষ স্পষ্ট চোখে।

: তুমি আমাদের ব্লকে কি করছিলে?

: বন্ধুর কাছে এসেছিলাম । ঘর গুলিয়ে গিয়েছিল, ওপরে উঠে গিয়েছিলাম ভুলে।

সন্দেহ ফিরে এলো । জিজ্ঞেস করলাম,

: নিয়ে চলো, কোন বন্ধুর কাছে এসেছিলে I

হেলতে দুলতে চললো একতলাতেই একটা ব্লকের দিকে। হাব ভাব দেখে আবার মনে হলো, ভুল করে ফেলেছি। একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মস্ত বড় তালা ঝুলছে। ঘরের দরজা বন্ধ দেখে, আবার সন্দেহ ফিরল, বোকা বানাচ্ছে না তো? মনে আমার আলো ছায়ার লুকোচুরি। পাশের ঘরে দরজাটা ভেজানো ছিল। টোকা মেরে ঢুকে গেলাম। ছেলেটি পড়াশোনা করছিল । প্রশ্ন করলাম,

: পাশের ঘরের ছেলেটা কোথায়?

: রোতক গেছে, বাড়িতে। কাল আসবে ।

এবার আগন্তুককে চেপে ধরলাম,

: বন্ধুর নাম বলো, কোথায় পড়ে?

এতো বড় হস্টেলে সঠিক না জানলে, কে কোন বিষয়ে পড়াশোনা করে বলা অসম্ভব। ঘটনার হঠাৎ এমন মোড় নেবে ভাবে নি। খাটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু যেন নার্ভাস । দরজার দিকে তাকাচ্ছে দেখলাম। দৌড়বে নাকি ? চোখে পড়লো, একটা চকচকে কিছু আড়াল করে তোষকের তলায় লুকোবার চেষ্টা করছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,

: আরে, ওই তো আমার পেন I

শান্তনু ক্ষেপে গিয়ে মারলো একটা ঘুষি I আঙুলে ছিল আংটি, কপালে ইঞ্চি দেড়েকের লাল কাটা দাগ পড়ে গেল । উত্তেজনায় আমাদের গলা ততোক্ষণে সপ্তমে চড়েছে। হস্টেলে সাড়া পড়ে গেছে। শ'খানেক ছেলের ভিড়, প্রবল উত্তেজনা। কলকাতায় দেখেছি, বাসে বা পাড়ায় চোর ধরা পড়লে তার ওপর সর্বসাধারণেরই সমান অধিকার থাকে। চোর নিয়ে ব্যাপারটা ওখানে অন্যরকম। চোরের মালিকানা যেন আমাদেরই। কেউ চোরের গায়ে হাত দিল না, শুধু একরাশ উত্তেজনা চারদিকে। আমি হয়ে উঠেছি হিরো । চুরি হয়েছিল আমার ঘরে আর সেই চোর ধরেও ফেলেছি। অনেকেই এসে আমাকে আর শান্তনুকে দেখে যাচ্ছে। ফিস ফিস করে আলোচনা চলছে আমাদের নিয়ে। আমরা দু'জন তখন যেন শার্লক হোমস আর ওয়াটসন।

দিনটা ছিল রবিবার। সবাই ঘরে, এমনকি ওয়ার্ডেনও তাঁর ফ্ল্যাটে। খবর পৌঁছে গিয়েছে। দিল্লী ইউনিভার্সিটির নামকরা হস্টেল জুবিলী হলে চুরি, চোরও পড়েছে ধরা। ওয়ার্ডেন মহোদয়ের জন্যও বড় ঘটনা। তাঁকেও রিপোর্ট করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে আমাদের কাছে অল্প বিস্তর শুনে বললেন, চোরকে থানায় নিয়ে যেতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীপ এলো । ওয়ার্ডেন বসলেন জীপের সামনের সিটে, ড্রাইভারের পাশে। পেছনে বসলো চোর। আর যেহেতু আমার ঘরে চুরি আর আমি চোর ধরেছি, তাই আমার অবস্থান চোরের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আমাকেও বসতে হলো চোরের সাথে, পেছনের সিটে। শান্তনুর ভূমিকা আমার তুলনায় কম হলেও প্রশংসনীয়। তাই ও বসলো আমার সাথে । বাকি ছেলেরা সবাই হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিল । সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে অনেকেই বললো, ওরাও আসছে থানায়, হেঁটে।

জীপের পেছনে দু'দিকে দু'টো বেঞ্চ, ওপরে গদি দেওয়া। মুখোমুখি বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। অস্বস্তি এড়াতে আমি মাথা বেঁকিয়ে জীপের পেছনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। চোর বুঝতে পারছি

একটু পরে পরেই আমায় দেখছে আড়চোখে, আমি চোখ সরিয়ে রেখেছি। এক সময় রাগ হলো। ও করেছে চুরি, দোষী যেন আমি। সোজাসুজি তাকালাম চোরের দিকে। চার চোখের মিলন হলো; আমার কঠিন দৃষ্টি দেখে মাথা নামিয়ে নিল। এর মধ্যে থানাও এসে গেছে।

ওয়ার্ডেন মহোদয় থানার বড়বাবুর সঙ্গে কথা বললেন। উত্তর ভারতে তাদের বলা হয় স্টেশন হাউস অফিসার। ওয়ার্ডেন আমাদের আশ্বস্ত করে, প্রয়োজনে খবর দিতে বলে চলে গেলেন। আমাদের দু'জনকে দেয়া হলো দু'টো প্লাস্টিকের চেয়ার, চোর বসেছে ঘরের কোনায়, মেঝেতে । অল্প পরেই হস্টেল থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন ছেলে থানার সামনে এসে জটলা শুরু করলো দেখলাম, একজন কাঁচের গ্লাসে এলাচ দেওয়া স্পেশাল চা এনে দিলো আমায় ও শান্তনুকে। ভালো লাগছিল, সাড়ে তিনশ' ছেলে থাকে হস্টেলে, অধিকাংশকেই চিনি না, অথচ প্রয়োজনে বন্ধুত্বে ঘাটতি নেই।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। থানার লোকজন যেন ভুলেই গিয়েছে আমাদের। বেলা সাড়ে বারোটায় দেখলাম থানার সামনে ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। রবিবার দুপুরে হস্টেলে খাবার বেশ ভালো থাকে। বন্ধুত্বেরও সীমা আছে, একটা বাজতে আর কেউ নেই । একবার জিজ্ঞেস করলাম এস এইচ ও কে, আর কতক্ষণ ? খুব গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন

: এত অস্থির হলে চলে না। সময় লাগবে।

সকাল থেকে দৌড়াদৌড়িতে খিদেও পেয়েছে। মনটাকে পেট থেকে সরাতে একঘেয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটার উৎস খুঁজতে লাগলাম। কাঠের আলমারি ভর্তি কাগজ আর ফাইল। দরজা খুললে আওয়াজ করে, বন্ধ করলেও। কেউ একটা চেয়ার টেনে বসতে গেলেও শব্দ হচ্ছে । একঘেয়ে শব্দটা আসছে মাথার ওপরের সিলিং ফ্যান থেকে। সব কিছুই থানাতে যেন আওয়াজ করে, শুধু পুলিশরা ছাড়া । মুখে কোনও শব্দ নেই, এঘর থেকে ওঘরে নিঃশব্দে ফাইল নিয়ে যাচ্ছে, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাউকে হাসতে দেখলাম না। টেলিফোন এলেও নিচু স্বরে একটা দু'টো শব্দে বাক্য শেষ। আবহাওয়াটা কেমন যেন যান্ত্রিক, গা ছমছম করা বাতাবরণ ।

আড়াইটে নাগাদ হিন্দিতে লেখা কিছু কাগজ নিয়ে একজন পুলিশ এলেন, মহিলা পুলিশ । শেষ পাতা বার করে আমায় দস্তখৎ করতে বললেন । তিন পাতাজুড়ে লেখা, ওটা হবে আমার দেওয়া ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা এফ আই আর। সেটা পেলেই পুলিশ আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্ত শুরু করবে। হিন্দিতে লেখা, সময় লাগলো পড়তে। আমার চক্ষু চড়ক গাছ, এক গাদা মিথ্যে লেখা,

আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম ছেলেটা আমার ঘর থেকে বেরোচ্ছে। ওর হাতে ধরা আমার কলম, মোজা, রুমাল ও দশ টাকার নোট । আমি ওকে দাঁড়াতে বললাম, ও শুনল না। দৌড়াতে লাগলো। আমিও ওর পেছনে দৌড়লাম। ও পড়ে গেল, কপাল কেটে গেল । আমি ওকে ধরে চেঁচালাম । শুনে আমার বন্ধু শান্তনু ও অন্যরা এলো। ওয়ার্ডেনকে খবর দিলাম, উনি আমাদের থানায় নিয়ে এলেন' ।

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে আমি বললাম,
: " এমন ডাহা মিথ্যে কথা আমি সই করবো না। যা সত্যি হয়েছিল, আমি ইংরাজিতে নিজে লিখে দিচ্ছি " I
পুলিশটি ঠোঁট উল্টে চলে গেল । আবার বসে আছি দু'জন, চোর মহাশয়ও । ব্যাজার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ও আমদের মতই একই রকম বিরক্ত।
প্রায় তিনটে নাগাদ এলেন এস এইচ ও। আমাদের দু'জনকে ডেকে নিয়ে ওঁর অফিস ঘরে বসালেন, গ্লাসে চা খাওয়ালেন। তারপর মিনিট দশেক যা বলে গেলেন, তার বিষয়বস্তু অনেকটা এরকম,

ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর চুরি হয়। পুলিশ অভিযোগ পায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগকারীরা তদন্তে সাহায্য করে না, অন্যত্র চলে যায়, কোথায় গিয়েছে তার ঠিকানাও পাওয়া যায় না। কেস দাঁড়ায় না, পুলিশের বদনাম হয়। এফ আই আর এ ভাবে না সাজালে, কোর্টে কেস ভেস্তে যাবে। চোরের উকিল সব কিছু উল্টে দেবে। দাবি করবে, ওই কলম, মোজা, রুমাল সব ওর। কি প্রমাণ আছে ওই কলম আমার ? আরও প্রশ্ন উঠবে, ওই কলম তো চীন থেকে স্মাগল করা। আমি কি করে পেলাম ?

গলা শুকিয়ে গেল। বাজার ভর্তি এই কলমে, সবাই লেখে; এমনকি আমাদের প্রফেসাররাও । মা জন্মদিনের জন্য গিফট কিনেছিলেন বাজারেই । আর পুলিশ বলছে স্মাগল করা জিনিষ ! তার মানে নিজের প্রতিদিন ব্যবহার করা জিনিষ নিজের প্রমাণ করতে মিথ্যে লিখতে হবে! বললাম,

: না। মিথ্যে লেখার চেয়ে, অভিযোগ না করাই ভালো। আমি অভিযোগই করতে চাই না I আমরা যাচ্ছি ।

এবার দেখলাম পুলিশ অফিসারটির চোখে বেশ রাগের আভাষ। বললেন ,

: আপনারা সাহায্য করলে ভালো হতো। ওর কাছ থেকে কথা বার করতে পারতাম, কোনও বড় চক্র এর মধ্যে জড়িত কি না, জানতে পারতাম। সকাল থেকে আমাদের ব্যস্ত রেখে, এখন আপনি যদি চান, ওকে আমরা ছেড়ে দেব। তবে একটা কথা, ও কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে ভাই, বন্ধু বা উকিল নিয়ে এসে দাবি করে যে, আপনারা ওকে চোর অপবাদ দিয়ে বেআইনিভাবে দু'ঘণ্টা আটকে রেখেছেন, মারধোর করেছেন, কপাল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছেন I আমি তখন আপনাদের নামে কেস করতে বাধ্য হবো " I

এ তো উল্টো বিপদ! চুরি হলো আমার ঘরে, আর কেস হবে আমার নামে! এই জন্যই বলে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ" I কথাটা সেদিন হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। অগত্যা, বিকেল সাড়ে চারটায়, পেটে খিদের আগুন নিয়ে, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে, মিথ্যে এফ এই আরে সই করে, থানা থেকে বেরিয়ে গেলাম। পেনের দুঃখ ততোক্ষণে ঘুচে গেছে, মনের কষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসে চেপে রেখে থানা থেকে বেরোতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আমার কলম, মোজা, রুমাল – আমি কিছুই ফেরত পেলাম না। সবই নাকি কোর্টে পেশ হবে, প্রমাণ হিসাবে এবং চোরের শাস্তি হলেই, আমি ফেরত পাবো।

বছর খানেক কেটে গেছে তারপরে নির্ঝঞ্ঝাটে। হঠাৎ আঘাত হয়ে এলো দু'টো চিঠি । একটা আমার, অন্যটা শান্তনুর। কোর্টের সমন, সাক্ষ্য দিতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। পুরনো ক্ষতটা আবার জেগে উঠলো, চোর জানবে, ওকে শাস্তি দিতে পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমি একরাশ মিথ্যা বলেছি !!

নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে পৌঁছলাম। ঢোকার আগেই, বাইরে অভ্যর্থনা করলো কালো কোট পড়া এক ছোকরা উকিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতটা বাড়িয়ে দিল, হ্যান্ডশেক করতে । বুঝছি না, কে এ ? কেন হ্যান্ডশেক করতে চায় ! চেনে নাকি আমাকে? ঠিক আছে, উকিল যখন, হাত মেলানো যেতে পারে। করমর্দন শেষ হয়নি, কালো কোটের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে অশরীরী আত্মার মত উদ্ভাসিত হলো সেই মুখ, লাজুক চোখ । এবার সেও হাত বাড়িয়ে দিলো। ততোক্ষণে চিনে ফেলেছি - ইনিই সেই শ্রীমান চোর।

মর্মান্তিক পরিবেশ। চারদিকে যেন এক স্থবির নীরবতা, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর আমার সামনে শূন্যে ঝুলছে একটা হাত, আমার হাতের অপেক্ষায় । হার মেনে, প্রায় স্লো মোশনেই হাত তুলে হ্যান্ডশেক করলাম I চোরের সাথে।

এখানেই গল্পের ইতি টানলে ভালো হতো, কিন্তু যবনিকা পড়লো না।

চোরের চ্যাংড়া উকিল বলে চললো

: ভুল করে ফেলেছে, ছেড়ে দিন। অল্প বয়স, পড়াশোনা করে। যদি আপনারা না বাঁচান, ওর জেল হতে পারে; সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে ছেলেটার। একটা সুযোগ দিন ওকে। এই সামান্য কয়েকটা টাকার জিনিষের জন্য জেলে পাঠাবেন ওকে?
রেগে বললাম: তার জন্য আমরা দায়ী নই। চুরি করেছে, ধরা পড়েছে, পুলিশ এখানে নিয়ে এসেছে। আমরা কি করবো?
আমি ও শান্তনু সরে গেলাম।

বুঝলাম, থানার ইন্সপেক্টরের কাহিনী সবটাই কপোলকল্পিত। কোনও চক্রই নেই । মামলাটা আমি আর আমার কলম, দশ টাকা, মোজা ও রুমাল চুরি করা চোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পুলিশের ভাষায় 'ওপেন অ্যান্ড শাট কেস' অর্থাৎ আমরা যাকে বলি 'জলবৎ তরলং', চুরি হয়েছে, চোর ধরা পড়েছে হাতে-নাতে, চুরির মালও পাওয়া গেছে, অতএব চোরের শাস্তি নিশ্চিত আর পুলিশের মাথায় জয়ের টীকা। কিছুক্ষণ লাগলো মনস্থির করতে।

ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের দু'জনের পরিচয় শুনেই আন্দাজ করে নিয়েছেন ঘটনার সত্যতা। বার দু'য়েক খুব বিরক্ত হয়ে ধমকালেন চোরের উকিলকে। কিন্তু সাক্ষী দিতে গিয়ে নিজের পেনকেই ঠিক চিনলাম না, মোজার রংটা আমার মনে নেই ।

ম্যাজিস্ট্রেট সিংহাসনের মত উঁচু চেয়ারে বসে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে, কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন। ওঁর টেবিলের ডানদিকে লেডি জাস্টিসিয়ার চোখ বাঁধা মূর্তিটা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে সাক্ষী হয়ে।

বিচারক বলে কথা। এমন কত চোর আর বিগড়ে যাওয়া সাক্ষী দেখেছেন। অল্পক্ষণেই বুঝে গেলেন, কোনও রকমে আমাদের সাক্ষ্য সারলেন ব্যাজার মুখে। সাক্ষীর কাজ শেষ হতেই দু'জনে কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, প্রায় দৌড়েই ।

আবার না কেউ ধন্যবাদ দিয়ে হ্যান্ডশেক করতে আসে !

চিন্ময় বসু

অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার। অবসরের পরে ওড়িশা পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ও ওড়িশা ফাইনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ।
বাংলা ও ইংরাজিতে প্রকাশিত বই
১। জীবনের ঝর্ণাকলম --- প্রকাশক: সোপান, কলকাতা ।
২। অফ মেন অ্যান্ড মেমোরিস --- প্রকাশক: অথরপ্রেস, দিল্লী।
এছাড়া কিছু গল্প/লেখা আনন্দবাজারের 'রবিবাসরীয়' পত্রিকা, অনলাইন ম্যগাজিন বাংলা 'পরবাস', ইংরাজি দা ফেডেরাল ডট কম ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বৃত্ত

দেবতোষ ভট্টাচার্য্য

নাহ, আজ আপিসে বসে বসেই একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন অর্ধেন্দুবাবু। প্রতিবার এই পুজোর সময়ই এত কাজের চাপ বাড়ে যে তাঁর নাওয়া খাওয়া মাথায় ওঠে। অনেক হয়েছে, এবার তিনি ছুটি নেবেনই নেবেন। গত চার বছর ধরে তাঁর ন্যাওটা একমাত্র ভাইঝিটির সঙ্গে আর দেখা করার সময় করে উঠতে পারছেন না – সে আদালতে তাঁর জন্য কি শাস্তি যে অপেক্ষা করছে কে জানে!

অর্ধেন্দুবাবু একা, অবিবাহিত – সারাদিন আপিস আর বাড়ী করেই তাঁর দিব্যি কেটে যায়। পরিচয় বলতে, এই বৈদ্যবাটি শহরের একমাত্র পোস্টঅফিসটির তিনি পোস্টমাস্টার বাবু। অমায়িক, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী বলে তাঁর বিশেষ সুনাম আছে এ অঞ্চলে। সেই কবে চাকরী নিয়ে এশহরে পা রেখেছিলেন, আজ প্রায় ভুলতেই বসেছেন তিনি – হ্যাঁ তা নয় নয় করে বছর পনেরো তো হবেই।

সে যাই হোক, কথা হচ্ছিল তাঁর দুর্গাপুরের বড়দার বাড়ী যাওয়া নিয়ে। যাওয়ার ঐ একটি জায়গাই বেঁচে আছে তাঁর, এবার পুজোয় না গেলে বোধহয় সে দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আর দেরী না করে সাত সকালেই ছুটির দরখাস্তটা করে ফেললেন। জানতেন মঞ্জুর হবেই, কারণ পারতপক্ষে তিনি ছুটি নেন না।

ষষ্ঠীর দিনেই যাওয়া ঠিক করলেন অর্ধেন্দুবাবু, ফিরতে ফিরতে সেই লক্ষ্মীপুজো। এদিকে পচি, মানে ভাইঝির একান্ত আবদার – তাই আগে ভাগেই মোদকদের দোকান থেকে কেজিখানেক মিষ্টি দই আনিয়ে রাখলেন। জামাকাপড় তেমন বিশেষ কিছু নেওয়ার ছিল না – ষষ্ঠীর দিন সকাল সকাল দুগ্গা দুগ্গা বলে স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলেন তিনি। ট্রেনে উঠে জানলার দিকে বসার তাল করছিলেন – কিন্তু যিনি বসেছিলেন তাঁর 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' ধরনের ভাবগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলেন।কোনার দিকের একটা সীটে পা মুড়ে আয়েশ করে বসতেই চোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম।

ঘুমিয়েই পড়লেন অর্ধেন্দু বাবু।

জীবনের কিছু কিছু ঘটনা প্রবাহ দেখে মনে হয় সবই কেমন যেন পূর্ব নির্ধারিত। এই নির্ধারণটি কে করে রেখেছেন ভাবতে বসলে, মানি বা নাই মানি, সেই ওপরের দিকেই অজান্তে আঙুল ওঠে। ভাগ্যতে বিশ্বাস রাখা হয়ত একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার – কিন্তু এক প্রবল ইচ্ছেশক্তি মানুষকে কখনো কখনো তার বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির স্বাদ পাইয়ে দেয়। কখনো হয়ত সেই ইচ্ছেটি থাকতে পারে মনের এত গভীরে যে বাইরের কেউ তা কোনদিন জানতেই পারেনা।

যাকগে এবার অর্ধেন্দু বাবুর কথায় আসা যাক। ঘড়িতে চোখ পড়তেই যাকে বলে তাঁর একেবারে ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। এতক্ষণে তো দুর্গাপুর পার হয়ে যাওয়ার কথা! জানলার ধারের সেই যুদ্ধং দেহি ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলেন তাঁর আশঙ্কাই সত্যি। হুড়মুড় করে পরের স্টেশনেই নেমে পড়লেন তিনি। ওদিকে ওরা নিশ্চয় খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। টিকিট কেটে ফেরার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু ট্রেন কখন যে পাবেন কে জানে।

চিন্তিত মুখে প্ল্যাটফর্মের এক হাতল ভাঙা বেঞ্চে বসে পড়লেন অর্ধেন্দু বাবু। আর ঠিক সেই সময় কানে এল এক নারী-কণ্ঠ – আরে! উজবুক না!
চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন সামনে এক শ্যামলা মধ্য তিরিশের মেয়ে, হাসি হাসি মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে।
ইয়ে....নাতো! আমি অর্ধেন্দু!
কাজল কন্যা এক বিশ্রী খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।
ঠিক ধরেছি! তা হঠাৎ রূপনারায়নপুরে কি মনে করে?
ঘামতে ঘামতে কাঁপতে লাগলেন অর্ধেন্দু বাবু। সবে চল্লিশ পার করেছেন, এর মধ্যেই হার্টের ব্যামো ধরল নাকি? এই বিকট হাসি যে তাঁর বিশেষ চেনা।
ধপ করে আবার বেঞ্চে বসেই পড়লেন তিনি।

দিব্যি গুনগুন করতে করতে হেলে-দুলে কাঁধে ঝোলা আর হাতে চিঠির তাড়া নিয়ে এগিয়ে চলেছে যে ছেলেটি, তার নাম অর্ধেন্দু মজুমদার। এ শহরে মাস খানেক হল পিওনের চাকরী নিয়ে এসেছে ছেলেটি। অর্ধেন্দুরা দুই ভাই, বড়ভাই শুভেন্দু পেশায় ইঞ্জিনিয়ার – বর্তমানে দুর্গাপুরে কর্মরত। মা-বাবা বড় ছেলের কাছেই থাকেন। অর্ধেন্দু ঘষটে ঘষটে বিএ পাশ করেই রূপনারায়নপুর পোস্টঅফিসে পিওনের চাকরীটা জুটিয়ে নিয়েছিল।
তা ভালোই চলছিল। কিন্তু ইদানীং একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছে সে। গত হপ্তায় চিঠি দিতে ঢুকেছিল ৩/১ কালীতলা লেনের নীল বাড়ীটায়। মীনাক্ষী সরকারের নামে একটা চিঠি এসেছে। তা একটু উলটে-পালটে খামটা দেখছিল, হঠাৎ -

- পরের চিঠি পড়ছেন কেন আপনি?
- ইয়ে...মানে নাত, পড়িনিত! ঠিকানাটা মেলাচ্ছিলাম!
- কি মিথ্যেবাদী! পরিষ্কার দেখলুম, আর বলছে নাত!
- এতো মহা জ্বালা, খামের ভেতরে চিঠি পড়ব কি করে?

হাত থেকে ছোঁ মেরে খামটা নিয়ে নিলো মেয়েটি। ভাল করে খেয়াল করল অর্ধেন্দু – বছর কুড়ি বয়স হবে, শ্যামলা রোগা গড়ন। একমাথা কালো চুল ঝর্ণার মত ধাপে ধাপে নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। নাহ, তেমন অসাধারণ কিছুই চোখে পড়ল না।

চিঠিটা দিয়ে হাঁপ ছেড়ে ফিরে আসছিল অর্ধেন্দু, হঠাৎ কানে এল খ্যাঁক-খ্যাঁক করে অদ্ভুত বিশ্রী হাসি। হতবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, কাজল কন্যা চুলের গোছা দুদিক দোলাতে দোলাতে বেদম হাসছে। চোখাচোখি হতেই কন্যে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল – উজবুক একটা!

মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অর্ধেন্দুর। সে শান্ত, অমায়িক, অতীব ভদ্র ছেলে – যদিও আজকাল কেন তখনও এগুলো লোকজন খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে নিত না। তাবলে এসব কি? এরপর থেকে ওপাড়া দিয়ে একটু তড়বড় করেই পালাত সে – কন্যের মুখোমুখি হয়ে পড়লে সে এক অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে!

- কি ব্যাপার! চিঠিটা ওভাবে ফেলে দিলেন কেন?

মুশকিল হল, আজ মীনাক্ষীর আবার চিঠি এসেছে – অগত্যা নীল বাড়ীর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই হল। ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি সদরের দিকে খামটা ছুঁড়েই দিয়েছিল অর্ধেন্দু। হাওয়ায় গোঁত্তা খেয়ে সেটা পড়বি তো পড় একেবারে উঠোনে। যেখানে বাঘের ভয়.....ধরা পড়ে গেল সে।

- কি আশ্চর্য, ফেলে দেব কেন। দরজার দিকেই ছুঁড়লাম তো!
- আলবাত ফেলে দিলেন! ওর কি ডানা আছে যে উড়ে গেল।
- আচ্ছা জ্বালা তো!
- হ্যাঁ, জ্বালাটা টের পাবেন যখন আপনার নামে পোস্টঅফিসে অভিযোগ যাবে।

কি ঢ্যাঁটা মেয়েরে বাবা, মাথা নাড়তে নাড়তে পা বাড়াল অর্ধেন্দু। আর তখনই আবার কানে এল সেই বিশ্রী হাসিটা – নাহ এবার আর পিছনে তাকাবার প্রবৃত্তি হল না তার।

পারতপক্ষে ঐ ৩/১ নীল বাড়িটার দিকে তাকাত না সে। আড়চোখেও না – একটা রাগ, লজ্জা, অস্বস্তি তাকে যেন গ্রাস করছিল। কিছুটা ভয়ও। এরমধ্যে তাকে আরেকদিন পাকড়াও করেছিল সে কন্যে – অভিযোগ, সে নাকি ওদের বাড়ীর চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সবার বাড়ী চিঠি আসছে, শুধু ওদের বাড়ীই নয় কেন? তা অর্ধেন্দু মিনমিন করে একবার বলার চেষ্টা করেছিল – মীনাক্ষী সরকারের নামে চিঠি না এলে সে কি করতে পারে, কিন্তু মেয়ের ফোঁসফোঁসানি দেখে আর কথা বাড়ায় নি।

সম্পর্ক সাধারণত শুরু হয় এক সুন্দর অনুভূতির মধ্য দিয়ে। সে এলে ঘোর লাগে, আড়চোখে চাইলে শরীর অবশ হয়ে পড়ে – আর চলে গেলে নাকে থেকে যায় এক মিষ্টি সুন্দর গন্ধ। অনেকেরই নাকি চোখে চোখ পড়লে কথা হারিয়ে যায়, হাতে হাত রাখলে শুরু হয় হৃদকম্প। এসবই অবশ্য আমার একেবারেই শোনা কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোনটাই ঘটে নি – তবুও অর্ধেন্দু শুতে বসতে তাকে চোখের সামনে থেকে কিছুতেই যেন সরাতে পারছিল না। একদিন ঝগড়টা না হলে মনটা কেন জানিনা ছটফট করত।

এদিকে পায়ে পায়ে পুজো এগিয়ে আসছে, কন্যে আবার পাড়ার পুজোর এক হর্তাকর্তা। তার চাঁদা তোলার উৎসাহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, যোগাড়যন্ত্রের হাঁকডাক আর লম্ফঝম্প অর্ধেন্দু যেন নিঃশব্দে অনুসরণ করত। তার বাচালতা, কারণে অকারণে খ্যাঁক-খ্যাঁকে হাসি, হরিণের মত ক্ষিপ্রতা – সে যেন কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না। প্রমাদ গুনল অর্ধেন্দু।

সকালের লেবুচা-টা শেষ করেছে কি করেনি, পোস্টমাস্টার বাবুর ঘরে ডাক পড়ল। কি হে ছোকরা, রোজ তো লোকের বাড়ি চিঠি দিয়ে বেড়াও – আজ দেখো তোমার নামেই এল চিঠি। পিঠে এক চাপড় মেরে খোলার জন্য তাড়া দিলেন সাহেব। ঘুরিয়ে দেখল অর্ধেন্দু খামখানা। পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে, ভেতরে টাইপ করা চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে চিঠিটা এগিয়ে দিল সাহেবের দিকে।

আরেব্বাস! এতো দারুণ খবর হে! তোমায় তো দেখছি বৈদ্যবাটিতে পোস্টমাস্টার পদে যোগ দিতে বলেছে – উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। এই শান্ত নিরীহ ছেলেটিকে সাহেব একটু বিশেষ স্নেহই করেন। কিন্তু কেন কে জানে অর্ধেন্দু তেমন খুশি হতে পারল না। এই কাজে যোগ দেওয়ার আগেই সে পরীক্ষা ও ইন্টার্ভিউ দিয়ে এসেছিল। আজ জানল, সে পাশ করেছে।

এই রূপনারায়নপুরের সাথে সাথে আরও অনেক কিছুকেই ভালবাসতে শুরু করেছিল অর্ধেন্দু – সে সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনা আসতে আসতে তাকে গ্রাস করতে শুরু করল। চারিদিকের পুজোর উন্মাদনা থেকে কিছুটা যেন গা বাঁচিয়েই চলতে লাগল কয়েকদিন। যদিও এবেলা ওবেলা কি এক অমোঘ আকর্ষণে পুজো মণ্ডপে রোজ হাজিরা দিত।

সবার আড়ালে দূরে কোনায় বসে সেই হাসি শোনার জন্য কান পাতত – তার উৎপত্তিস্থল বোঝার চেষ্টা করত। দশমীর দিন যখন সবাই সিঁদুর খেলছে, কাজল কন্যা কারণে অকারণে চতুর্দিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে – তখনই ঠিক সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল অর্ধেন্দু। সবার অলক্ষ্যে মুচকি হাসলেন বিধাতাপুরুষ।

সেদিনই একটা সাদা কাগজে চিঠি লিখে শেষবারের মত ৩/১ নীল বাড়ীতে ঢুকল সে। খামে ভরে চিঠিটা সদরে ফেলে প্রায় দৌড়েই পালাল যেন। হাতে সময় নেই মোটে। লক্ষ্মীপুজোর পরেই যোগ দিতে হবে নতুন কাজে – শান্ত হয়ে গোছগাছে মন দিল অর্ধেন্দু।
রূপনারায়নের জলে প্রতিমা ভাসান চলছে, চরে দাঁড়িয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবেই যেন সেদিকে তাকিয়ে ছিল অর্ধেন্দু। হঠাৎ একটা হলুদের ঝড় উঠল – মাটি ফুড়ে উদয় হল যেন তার।

- এটা কি?
- কোনটা? ধীরস্থির অর্ধেন্দু!
- অ! চোখটাও গেছে তাহলে। এই হাতেরটা!
- একটা খাম দেখছি তো!
- উফ! এই খামের ভেতর এটা কি? ফুঁসে উঠল যেন হলুদ কন্যে।
- একটা কাগজ মনে হচ্ছে।
- আপনার এত সাহস, এইসব চিঠি লেখেন! আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিৎ।
- ছিঁড়ে ফেলে দিলেই হয়! মিনমিনে অর্ধেন্দু!
- হ্যাঁ তাই উচিৎ। ফের যদি...

বলে কুচিকুচি করে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল মেয়েটি। যাওয়ার সময় যেন গর্জন করে গেল –
- আমার নাম বনানী, মীনাক্ষী মায়ের নাম। তার হাতে এটা পড়লে আপনাকে আর দেখতে হত না! আস্ত উজবুক একটা।

কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল অর্ধেন্দু। বার বার মনে করার চেষ্টা করল, সীতা ঠিক কি মন্তর পড়ে ফুড়ুৎ করে পাতালে প্রবেশ করেছিল। নাহ, কিছুতেই কিছু হল না – বহু আবেদন নিবেদনেও ধরিত্রীর মন গলল না। দাঁড়িয়েই রইল খাণিকক্ষণ।
পরদিন সকালে স্টেশনের চেয়ারটায় বসে বসে খালি মনে হচ্ছিল কেউ যেন তার ওপর নজর রাখছে। এদিক ওদিক কিছুই তেমন নজর পড়ল না অবশ্য – তবে একটা হলুদ শাড়ী কি লুকিয়ে পড়ল খামের আড়ালে? চোখের ভুল বোধহয়! ট্রেন এল, পাদানিতে পা দিয়ে আর একবার পিছনে চাইল চকিতে। আবারও যেন মনে হল সেই হলুদ প্রজাপতি উড়ে গেল। নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল অর্ধেন্দু। গাড়ী চলতে শুরু করল। কদিন দুর্গাপুরে দাদার কাছে কাটিয়ে তারপর নতুন কাজে যোগ দেবে। মন থেকে যেন মুছে ফেলতে চাইল অতীত ও এই বর্তমানকে।
যেন একটা সাদা কালো সিনেমা দেখছিল অর্ধেন্দু। যে অতীতকে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মুছে দিতে চেয়েছিল মন থেকে, তা হঠাৎ তার সামনে আবার উদয় হয়েছে। একটু যেন ঘোরের মত হয়েছিল – সম্বিত ফিরতে তেনাকে আর দেখতে পেলো না। চুপি চুপি কেটে পড়াই শ্রেয় ভেবে উঠতে যাবে, হঠাৎ কলারে টান।
-
চললে কোথায়? খোঁজ নিয়ে এলুম – কাল ভোর চারটের আগে ট্রেন নেই। রাত্তিরটা আমার ওখানেই কাটিয়ে দেবে চলো।

- ইয়ে...মানে একটা রাত প্ল্যাটফর্মেই ...
- কি???
- না...কিছু না। এখানে কাছে পিঠে লজ নেই?
- আছে...সবকটা রক্তদান শিবির...মশা ছারপোকা সব পাবে। হাতে ওটা কি? দাও....
- না...এটা পচি, মানে আমার ভাইঝির জন্য স্পেশাল দই।
- আচ্ছা উজবুক, আমি খেয়ে নেব নাকি?

দই হাতে হনহন করে বনানী চলল, অর্ধেন্দু তাল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল। এরই মধ্যে জেনে নিয়েছে, বনানীর বাবা মারা গেছেন – মা মেয়ে সেই নীল বাড়ীতেই থাকে। ইংলিশে এম এ কমপ্লিট করে বনানী আসানসোলের এক স্কুলে চাকরী নিয়েছে।

গেট খুলে ঢোকার সময় কন্যে একবার ঝালিয়ে নিয়েছিল – আমার নাম মনে আছে? হ্যাঁ তো! মীনাক্ষী! এই যা: না না বনানী...বনানী!

কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল বনানী। এই প্রথম মীনাক্ষী, মানে মীনাক্ষী দেবীকে সামনে থেকে দেখল অর্ধেন্দু। তার থাকার জায়গা হল চিলেকোঠার ঘরে। এখন একটু রেস্ট নিয়ে নাও, ফিরতে রাত হবে, কাল সপ্তমী, গুচ্ছ কাজ পড়ে আছে, ডিনার একসাথেই করব কিন্তু – ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল বনানী। এটা তার পড়াশুনোর ঘর, চতুর্দিক বই ছড়ান – তার মধ্যেই একটা ছোট চৌকি দেখে শুয়ে পড়ল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ লেগে এল। ও হ্যাঁ, এ বাড়ি থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে – ট্রেন মিস হয়েছে, কালকেই আসবে অর্ধেন্দু। সত্যি কথাটা আর বলা গেল না।

ডিনার সেরে ছাদে একাই খানিকক্ষণ পায়চারি করল অর্ধেন্দু। ঘরে ফিরে এ বই ও বই নাড়তে নাড়তে একটা পড়ার জন্য তুলতেই ফস করে কি যেন ঝরে পড়ল মাটিতে। একটা কাগজ। লাল হয়ে গেছে কাগজটা – খুলে চোখের সামনে ধরতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যেন।

“মীনাক্ষী, জানিনা আজ কেন হঠাৎ এই চিঠি লিখতে বসলুম। সত্যিই তো তেমন কোন কারণ ঘটেনি। তোমার সঙ্গে আমার আজীবন ঝগড়ার সম্পর্ক – সন্ধির কোন আশাই নেই। তবু একদিনের জন্যও এই ঝগড়া না হলে কেন বলতো আমার কিচ্ছুটি যেন ভাল লাগে না। জানি – এর উত্তর আমাদের কারোরই জানা নেই।

কিন্তু আর বোধহয় না। আমি চলে যাচ্ছি। মানে চলে যেতে হচ্ছে। পোস্টমাস্টার পদে যোগ দিতে হবে আমায় – কালকেই ট্রেন ধরতে হবে ভোরে।

গুছিয়ে সুন্দর চিঠি লেখা আমার কম্মো নয় – কিন্তু কি করি বলতো? এই ঝগড়াঝাঁটি কি তাহলে সত্যিই চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে?

এই উজবুককে বিয়ে করবে, মীনাক্ষী? দিব্যি আরাম করে আজীবন কিন্তু ঝগড়া চালিয়ে যেতে পারবে!”

তাহলে সেদিন যে চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিল বনানী, সেটা কি ছিল? না: আর ভাবতে পারছে না অর্ধেন্দু। হাতেই রয়ে গেল চিঠিটা, খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়ল সে। অন্ধকারে টের পাওয়া যায় নি – একজন কখন যেন চুপিচুপি এসে

দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশটিতে। টের পেতেই দেখে তার বাঁ হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে চেয়ে আছে একজোড়া সজল কাজল চোখ – ফিসফিস করে সে বলল...

আমায় বিয়ে করবে, উজবুক?

আহ, দেখেছ উত্তুরে শীতল হাওয়াও কেমন জানলার ওধারেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আকাশের চাঁদ যেন ভুলেই গেল এখনো বহু দূর তার চলা বাকি। খেয়াল করলেই দেখতে পাবে দেওয়ালের টিকটিকিটাও লেজ খাড়া করে ঘাড় বেঁকিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। তবে আমি কিছু শোনার চেষ্টা করিনি। বহু বছরের জমে থাকা ক্ষোভ, দুঃখ আর অভিমানের আজ শেষ হতে চলেছে – নাই বা ওদের বিরক্ত করলুম আজ।

সপ্তমীর ভোরে স্টেশনে হাজির হল অর্ধেন্দু, বনানী তাকে তুলে দিতে এসেছে। জানলার ধারের সীটটাই পাওয়া গেল। বসে পড়ে বনানীকে প্রশ্নটা করেই ফেলল সে। সেদিনও কি তুমি এসেছিলে? স্টেশনে? ওতরফ মাথা নিচু করেই রইল। ট্রেন চলতে শুরু করল...ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বনানী।

অর্ধেন্দুর কেন জানিনা মনে হচ্ছে, এ সবই সে মেয়ের কারসাজি। বৈদ্যবাটি স্টেশনে গাড়ীতে ঠিক ওঠার আগে যে লেবুচা খেয়েছিল, তাতে নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর ঠিক রূপনারায়নপুরের আগে যে হতচ্ছাড়া পেয়ারাওলা সাড়ে সাতবার হেঁচে তার ঘুমটা ভাঙ্গিয়েছিল, সেও এ মেয়েরই ফিট করা। হতেই হবে!

নাহ, এবার আর কিছুতেই ঘুমোবে না অর্ধেন্দু। দুর্গাপুরে তাকে নামতেই হবে। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা, কথাবার্তা চালানো, যোগাড়যন্ত্র করা – এসব মোটেও তার কম্মো নয়। বৌদিকে হাত করতেই হবে!

দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। নিশ্চয় কলাবউ!!!

প্রবাসী বাঙালী দেবতোষ ভট্টাচার্য কর্মসূত্রে আজ বহু বছর ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। অবসর সময়ে অল্পবিস্তর লেখালেখির বদভ্যাস আছে, আর লেখার মাধ্যমে যদি একবার বই পড়ার নেশাটি কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটাই হবে তাঁর মস্ত পাওয়া।

অনুশোচনের বৃত্ত

অনন্যা দাশ

ফোনটা যখন এল তখন আমি স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে রাজস্থানে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসলে এমনিতে ধরি না কিন্তু এই নম্বরটা দেখি কী মনে করে ধরে ফেললাম। প্রথমে ওপাশ থেকে কেউ কথা বলছিল না। তিন চারবার হ্যালো হ্যালো করার পর অপর প্রান্ত থেকে মহিলা কণ্ঠে একজন বলল, "মিস্টার সেনগুপ্ত? ওসি প্রতাপ সেনগুপ্ত বলছেন কী?"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আমি প্রতাপ সেনগুপ্ত বলছি। তবে পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি বেশ কিছুদিন হল তাই ওই পদবি আর ব্যবহার করি না। আপনি কে বলছেন?"

"জানি না আমাকে আপনার মনে আছে কিনা। আমি মিসেস ভট্টাচার্য বলছি। সায়ন্তন মানে শানুর মা।"

আমার মাথায় বাজ পড়ল। পুরনো সিনেমার মতন আমার চোখের সামনে সব কিছু ভেসে উঠল। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল সায়ন্তন ওরফে শানু। মা-বাবার একমাত্র ছেলে। যাতে হাত দেয় তাতেই অসাধারণ। দারুণ ছবি আঁকে, গান গায়, আবৃত্তি করে আবার পড়াশোনাতেও খুব ভাল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল সে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল আর মা-বাবার সঙ্গে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানেই হঠাৎ একদিন সে আত্মহত্যা করল প্রচুর ঘুমের ওষুধ খেয়ে। শানুর নিজের হাতের লেখা একটা চিঠিও পাওয়া গিয়েছিল যাতে সে লিখেছিল 'মা-বাবি, আমাকে ক্ষমা করে দিও'। পোস্ট মর্টেমেও কনফার্ম হয় যে ঘুমের ওষুধ খেয়েই তার মৃত্যু হয়েছিল। কেসটা আমার আওতায় পড়েছিল তখন। ওর মা-বাবা ছেলের শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না প্রায়। কেন আত্মহত্যা করেছিল শানুর মতন ছেলে সেটাই তখন সবার কাছে একটা রহস্য। সেই শানুর মা কিনা ফোন করেছেন আজ আমাকে!

"মিসেস ভট্টাচার্য! হ্যাঁ বিলক্ষণ মনে আছে! আপনাদের ভোলা আমার পক্ষে সহজ নয় মোটেই। কেন আশাকরি বুঝতে পারছেন। শানুর কেসটা আজও আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতন।"

"ওসি সেনগুপ্ত, আমি সবই বুঝি..."

"মিসেস ভট্টাচার্য, আমাকে ওসি বলবেন না দয়া করে। বললাম না পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি আমি।"

"আপনি আমার কাছে সব সময় ওসি সেনগুপ্তই থাকবেন। তা যেটা বলছিলাম, আপনি একবার আসতে পারবেন আমাদের এখানে? কিছু কথা ছিল।"

আমি ওনাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমার একটু কাজ আছে আমি যদি দিন দশেক পর যাই। কিন্তু উনি শুনলেন না বললেন, "আমার হার্টের অবস্থা বেশ খারাপ ওসি। দশ দিন বেঁচে থাকব কিনা তার ঠিক নেই। ডাক্তাররা বাইপাস ইত্যাদি অনেক কিছু করতে বলেছেন কিন্তু আমি আর ওই সব দিকে যাইনি। শানুটা চলে যাওয়ার পর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই তো চলে গেছে। কার জন্যে বাঁচব? রাহুল এসেছিল। কয়েকটা কথা বলল যেগুলো আগে বলেনি। আপনাকে বলতে ভয় পাচ্ছিল। সেই কথাগুলোই আপনাকে বলতে চাই...কিছু সূত্র..." ভদ্রমহিলা কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি দেখলাম আমাকে যেতেই হবে। ওঁর বাড়ি যেতে আমার ঘন্টা খানেক লাগবে। এখন দুপুর বারোটা। তিনটে নাগাদ আমাদের ফ্লাইট। সেটা ধরতে পারার কোন সম্ভাবনাই নেই। নন্দিতা তো আমার কথা শুনে বেদম খেপে গেল। সারা জীবনে যত ভুল আমি করেছি সেই সব তুলে চিৎকার করতে লাগল। রোশনি বরঞ্চ বেশ ম্যাচিওর ভাবে মাকে বলল, "মা তুমি চিৎকার করে বাবাকে আটকাতে পারবে না। জানো তো ওই কেসটা নিয়ে বাবা কতটা ধাক্কা খেয়েছিল। যেতে দাও বাবাকে। রাজস্থান ক্যান ওয়েট।"

ওর কথা শুনে নন্দিতা থমকে গেল। আমি সেই সুযোগে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। ভাগ্য ভালো সুজয়, মানে আমাদের জন্যে যে গাড়ি চালায় সেই ছেলেটা এসে পড়েছিল। আমার মাথায় যখন রাজ্যের চিন্তা তখন আমার গাড়ি চালাতে একদম ভালো লাগে না। সুজয়কে মহিলার দেওয়া ঠিকানাটা দিয়ে আমি চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম সেই কুড়ি বছর আগেকার ঘটে যাওয়া ঘটনা।

আমি তখন ওই জায়গার ওসি। বেশ কয়েকটা কেসে কিনারা করে ফেলে নিজেকে একেবারে কেউকেটা ভেবে বসে আছি এমন সময় একদিন সকাল দশটা নাগাদ শানুদের বাড়ি থেকে ফোন এল। শানু ঘুম থেকে উঠছে না দেখে ওদের কাজের লোক মহেশ চা নিয়ে শানুর ঘরে গিয়েছিল। সেই আবিষ্কার করে যে শানু মৃত।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকারী রঘু আর অন্যান্যদের নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ততক্ষণে ওদের বাড়িতে লোকেদের ভিড় জমা হয়ে গেছে। আন্দাজ করা হচ্ছিল যে ঘুমের ওষুধ খেয়েই আত্মহত্যা করেছে শানু। ওর বাবা শুধু এইটুকু বললেন যে ঘুমের অসুবিধা ছিল বলে ডাক্তার ওকে ঘুমের ওষুধ খেতে বলেছিলেন। বিছানার কাছের বেডসাইড টেবিলে ঘুমের ওষুধের খালি শিশি আর চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল। একটা অর্ধেক খাওয়া জলের বোতলও ছিল। ফোনেই ওদের বলেছিলাম কোন কিছুতে হাত না দিতে। জলের বোতল, ওষুধের শিশি সব কিছু আমাদের জিম্মায় চলে এল। বডি পোস্ট মর্টেমের জন্যে চলে গেল।

বাড়িতে লোক বলতে শানুর মা, বাবা, কাজের লোক মহেশ আর শানুর পুরনো বন্ধু তন্ময় আর তার বোন কল্পনা। ওর মা-বাবা তো এতটাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে কোন কথা বলার মতন অবস্থায় ছিলেন না। যা বলার শানুর বন্ধু তন্ময়ই বলছিল। ওর কাছেই জানলাম যে ওর সঙ্গে শানুর খুব ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব। প্রায়ই ছুটিছাটাতে দেখা হত ওদের।

রঘুই এর ওর সঙ্গে কথা বলে পরে আমার রিপোর্ট করতে এসেছিল। ওর কথাগুলো আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে। রঘু বলেছিল, "বেশ অদ্ভুত ব্যাপার স্যার। ছেলেটার ব্যাপার স্যাপার দেখে কিন্তু একদম বোঝার উপায় ছিল না যে সে আত্মহত্যা করবে!"

আমি বলেছিলাম, "কী রকম?"

রঘু বলল, "আরে দুদিন আগেই প্রতিবেশী শঙ্কর পালের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল শানুর।"

"ও, তাই নাকি। কী নিয়ে?"

"শঙ্কর পাল ওদের জমি আর বাড়িটা কিনতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু শানুরা বেচতে চায়নি। শঙ্কর পালের বক্তব্য ওরা বছরে একবার কী দুবার আসে আর বাকি সারাটা বছর বাড়ি জমি এমনি পড়ে থাকে। শঙ্কর পালের জমির দরকার অথচ এরা কিছু

না করেও জমি আঁকড়ে বসে রয়েছে কিন্তু বিক্রি করবে না। সেই নিয়েই শানুর সঙ্গে প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল ঝামেলা। তন্ময় শেষমেশ শানুকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায় ওখান থেকে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা এই তন্ময়ের ব্যাপারটাও একটু কেমন কেমন, সে বোনকে নিয়ে কেন এসেছিল?"

রঘু হেসে বলল, "সেটা খুব সহজ স্যার। তন্ময় আশা করছিল ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে শানু যখন চাকরি করবে তখন কল্পনাকে বিয়ে করবে!"

"ও বাবা! প্রেমও রয়েছে ইকুয়েশানে!"

"না তবে শানু স্মার্ট ছেলে, ওর কল্পনাকে পছন্দ ছিল কিনা জানা যায়নি।"

"আচ্ছা মহেশের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?"

"মহেশ পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছে ওদের সঙ্গে। সে হয়তো অনেক কিছুই জানে কিন্তু তার পেটে বোমা মারলেও সেই সব কথা বেরোবে না। সে বলল দরজা ভেজানো ছিল কিন্তু ছিটকিনি দেওয়া ছিল না। সে কয়েকবার টোকা দিতেও যখন শানু জবাব দেয়নি তখন সে দরজা ঠেলে খুলে ভিতরে ঢুকে দেখে ওই কান্ড। শানুর ঘরে একটা সিঙ্গেল বেড খাট ছিল, ও ওই ঘরে একাই শুত। বিশেষ করে ওর ঘুম আসে না বলে মনে হয়। তন্ময় শানুর বাবার সঙ্গে শুচ্ছিল আর কল্পনা শানুর মার সঙ্গে। ওরা কেউই কিছু দেখতে বা শুনতে পারেনি।"

এর পর শ্রাদ্ধের কাজকর্ম ইত্যাদি সেরে শানুর মা-বাবা বাড়ি বন্ধ করে শহরে ফিরে গেলেন।

তারপর যেটা ঘটল সেটাতে আমার সব ধারণা উল্টো পালটা হয়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা আমি যখন অন্য কাজে ব্যস্ত তখন রামরতন এসে বলল, "স্যার, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

আমি সময় নেই বলে কাটিয়ে দিতে চাইছিলাম তখন রামরতন বলল, "বলছে শানু ভট্টাচার্যকে নিয়ে কিছু কথা ছিল।"

আমার কী মনে হল আমি তাকে আসতে দিলাম। বছর কুড়ির একজন যুবক এসে ঘরে ঢুকল।

"স্যার আমার নাম রাহুল।"

"কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো, আমার হাতে বেশি সময় নেই!" আমি অন্য কাজ করতে করতেই অকে বললাম।

"স্যার শানু আত্মহত্যা করেনি। ও আত্মহত্যা করতে পারে না স্যার।"

"কেন?"

"ও আমাকে বলেছিল ও চোদ্দ তারিখে ফিরবে। পনেরো তারিখে আমাদের যে একটা বড়ো পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল। ও খুব এক্সাইটেড ছিল স্যার সেটা নিয়ে। কাউকে বলিনি আমরা কারণ কতৃপক্ষ বলেছিল ব্যপারটাকে গোপন রাখতে। যেন সেদিনই জানতে পারলাম পুরস্কার পাওয়ার সময় এমন ভান করতে। কেন ও সুইসাইড করবে আপনি বলতে পারেন? হি হ্যাড এভরিথিং টু লিভ ফর! হি ওয়াস সো ফুল অফ লাইফ!"

“ও তো ঘুমের ওষুধ খেতো, ওর ডিপ্রেশান হতেই পারে...!”

“ঘুমের ওষুধ? আপনার কী মাথা খারাপ? ওর ঘুমের কোন সমস্যাই ছিল না! বরং খুব নাক ডাকত বলে আমরা ওকে খেপাতাম। আমার রুমমেট ছিল ও। যেখানে সেখানে যখন তখন ঘুমোতে পারত! ঘুমের কোন সমস্যাই ছিল না।”

আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বললাম, “তাহলে ও অতগুলো ঘুমের বড়ি একসঙ্গে পেল কী করে?” আমার সব থিওরি গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ওর বাবা বলেছিলেন ও ঘুমের ওষুধ খেত! আমরা অবশ্য প্রেসক্রিপশান চেক করনি!

“সেটা জানি না। তাছাড়া ওর একজন গার্লফ্রেন্ডও ছিল। তার নামটা আমাকে বলেনি কিন্তু ইঙ্গিত করেছিল যে বিয়ে করবে। এই অবস্থায় ও আত্মহত্যা করতেই পারে না! আপনাদের কিছু ভুল হচ্ছে স্যার!”

রাহুল চলে যাওয়ার পর পরীক্ষায় দেখা গেল জলের বোতল আর ঘুমের বড়ির শিশিতে কোন হাতের ছাপ নেই। অর্থাৎ কেউ মুছে সাফ করে দিয়েছে! আমার মাথা ততক্ষণে ভোঁ ভোঁ করছে। আমার ভুলে তদন্তটা মাঠে মারা গেল! আমি সেই রকম তৎপর ছিলাম না। কেসটাকে আত্মহত্যা বলেই ধরে নিয়েছিলাম! কী হয়েছিল সেদিন রাতে আমি আজও জানি না। রাহুল চলে যাওয়ার পর অনেক খুঁজেও আমি শানুর মা-বাবাকে খুঁজে পাইনি। কিন্তু আমার জীবনের সমাধান না করতে পারা কেসগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল শানু ভট্টাচার্যের মৃত্যুর কেসটা। এর পর বহুদিন ধরে মাথার চুল ছিঁড়েছি কিন্তু ওই কেসের সমাধান আমরা করতে পারিনি।

তারপর এতদিন পর শানুর মার ফোন!

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে শানুর মার দেওয়া ঠিকানাটায় পৌঁছে গেলাম। একটা বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। আনন্দ অ্যাপার্টমেন্টস। ফ্ল্যাট নং ৭০২ সাত তলার একটা ফ্ল্যাট। সুজয়কে নিচে গাড়ি নিয়ে থাকতে বলে লিফটে করে সাত তলায় গিয়ে হাজির হলাম। দরজার বেলটা টিপতে এক ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুললেন।

তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলাম! শানুর মা। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তাঁর! একেবারে হাড়জিরজিরে। চোখগুলো কোটরে বসা, ফর্সা চামড়ায় তামাটে ছোপ।

“ওসি সেনগুপ্ত! এতদিন পরও আপনি আমার কথা শুনে আসবেন সেটা আমি ভাবতে পারিনি! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি এসেছেন! আমাকে কেমন দেখছেন? অনেকটাই বদলে গেছি তাই না? শোক, বুঝলেন তো, শোক সব কিছু বদলে দেয়। আসুন, বসুন। আপনি কিন্তু চুল পাকা ছাড়া একই রকম আছেন।”

ঘরে আসবাবপত্র খুব কম, প্রায় নেই বললেই চলে। তিনটে কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল। টেবিলের ওপর দুটো জলের গেলাস। ঘরের একটা দেওয়ালে শানুর একটা বাঁধানো ছবি। তাতে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া।

আমি আর ভণিতা না করে সোজা দরকারি কথায় চলে গেলাম, যদি তাড়াতাড়ি বেরোতে পারি এখান থেকে তাহলে ফ্লাইটটা...
“কেন ডেকেছেন আমাকে বলুন তো?”

একটা শুকনো হাসি হাসলেন মিসেস ভট্টাচার্য, “কেন আবার? সেদিন রাতের ঘটনাটার রহস্যভেদ করতে।”

“ও, তা শানুর বাবা কোথায়?”

“উনি একটু বেরিয়েছেন। সেই জন্যেই আপনাকে ডেকেছি। উনি থাকলে তো আর কথা বলা যেত না! বকেঝকে শেষ করে দিতেন একবারে!”

“আচ্ছা, আপনি যে ফোনে বলছিলেন রাহুল এসেছিল, সে কিছু কথা বলেছে। কী কথা?”

“বলছি। আপনি চা জল কিছু খাবেন?”

“না, না, ওসবের প্রয়োজন নেই। আপনি যা বলার বলুন।”

ভদ্রমহিলার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে চেয়ারে বসে বললেন, “ঘটনাটার সূত্রপাত আমাদের দেশে যাওয়ার কিছুটা আগে থেকেই। শানুর কলেজে ছুটি হওয়ার পর ওর বাবার ওকে নিতে যাওয়ার কথা ছিল। তার প্রধান কারণ গাড়িটা সঙ্গে থাকলে জিনিস নিয়ে আসতে সুবিধা হয়। শানুর বাবা ছেলেকে নিয়ে আসার উত্তেজনায় আগের দিন রাতেই রওনা হয়ে খুব ভোরে ওদের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাহুল আর শানু থাকছিল। কবে যে শানু আমাদের একটা চাবি দিয়েছিল বাড়ির আমার মনেও নেই কিন্তু শানুর বাবার মনে ছিল। সেই চাবিটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেকে সারপ্রাইজ দেবেন বলে খুব ভোরে চাবি খুলে ওদের বাড়িতে এবং ঘরে ঢুকে পড়েন।

তারপর যা দেখেছিলেন তাতে নিজেই খুব সারপ্রাইজ...না সারপ্রাইজ কথাটা তো মনে হয় ভাল অর্থে ব্যবহার হয়, উনি শক পেয়েছিলেন। চিন্তাধারা খুব সেকেলে ছিল। শানুর দাদু, তাঁর বাবা সব পুরোহিতগিরিও করেছিলেন। শানুর বাবা তাই একমাত্র ছেলের সমকামিতা ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। উনিই তন্ময় আর কল্পনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল শানুকে কল্পনার সঙ্গে বিয়েতে রাজি করানো। উনি মনে করেছিলেন বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

কিন্তু শানু ঘোর আপত্তি করে। সে স্পষ্ট বলে দেয় যে কল্পনাকে সে বিয়ে করবে না। একটা নিরীহ মেয়ের জীবন নষ্ট করার কোন ইচ্ছে তার নেই। রাহুলকে সে ভালোবাসে এবং তার সঙ্গেই জীবন কাটাতে চায়! যে চিঠিটাকে সুইসাইড নোট বলে চালানো হয় শানু সেই চিঠিটা লিখেছিল কল্পনাকে বিয়ে করতে পারবে না বলে ক্ষমা চেয়ে। কিন্তু ওর বাবার রাগ কমল না। বললেন, ‘ওই রকম ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো!’ ঘুমের ওষুধ আমি খেতাম। আমার থেকে নিয়ে শানুর জলের বোতলে মিশিয়ে দিলেন। ও প্রচুর জল খেত। রাতে ঘুমের মধ্যেই যে পুরো বোতলটা খালি করে দেবে সেটা আমরা জানতাম। পরদিন ভোরে শুধু অন্য একটা বোতল আর ওষুধের খালি শিশিটা রেখে দেওয়া হয় ওর ঘরে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল কিন্তু কিছু বলতে পারিনি আমি। যেমন বলতে পারেনি মহেশ। সেও সব জানত কিন্তু শানুর বাবাকে প্রচন্ড শ্রদ্ধা করত তাই চুপ করে থেকেছে। ওই ঘটনাটার কিছুদিন পরই মারা যায় সে।” এতটা বলে মিসেস ভট্টাচার্য থামলেন। দরদর করে ঘামছেন তিনি।

টেবিলের জলের গেলাসের একটা তুলে নিয়ে কিছুটা খেয়ে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, “আমাকে ক্ষমা করবেন প্লিজ। আমি আপনাকে কয়েকটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম। রাহুল এসে কিছু বলেনি আর শানুর বাবাও গত হয়েছেন আজ এক মাস হল। বেশ কিছুদিন ধরে প্যারালিসিস হয়ে বিছানায় ছিলেন। আমাকে দিব্যি দিয়েছিলেন যে উনি বেঁচে থাকতে আমি কাউকে কিছু বলব না। এখন তো আর মানুষটাই নেই তাই দিব্যি তো থাকার কথা নয়! হিরের টুকরো ছেলেটাকে আমার মেরে ফেললেন ওই একটা দোষের জন্যে! এখন তো অনেক উদার হয়েছে সমাজ এবং লোকে কিন্তু ওর বাবা সেদিন উদার হতে পারেননি। আমারই কপাল, কপালে দুঃখ থাকলে খন্ডায় কে! দেশের বাড়ি ছেড়ে আমরা যখন অজ্ঞাতবাসের পথে গেলাম তখন শানুর

বাবা বলেছিলেন, 'কিছু ভেবো না সুরমা, সব ঠিক হয়ে যাবে'। কিন্তু আমি জানতাম আর কোনদিন কিছু ঠিক হবে না। হয়ওনি কোনদিন।
আমরা দুঃখের কুয়াশার মধ্যে কাটিয়েছি বাকি জীবনটা। শানুর বাবা চেয়েছিলেন শানু যেন একেবারে নিখুঁত হয়। এতটুকু খুঁত পেয়েছেন মনে করেই ওকে শেষ করে দিলেন। আর আমি হতভাগী কিছু বলতেও পারলাম না। যাক, আপনাকে খুব ঝামেলায় ফেলেছিলাম তখন আমরা তাই সত্যটা বলে দিতে চেয়েছিলাম এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে।"
ওঁর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, "আপনি কী...?"

"হ্যাঁ, ওই দিকের জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ওটা খেলাম। আমি মনে করি যে খুন করে আর যে খুন করতে সাহায্য করে তাদের অপরাধ সমান ওসি সেনগুপ্ত। শানুকে মেরেছিলাম আমরা সবাই মিলে। শুধু শানুর বাবা নয়, আমরা সবাই সমান দোষী।"

এর পর ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স অনেক কিছুই ডেকেছিলাম আমি, কিন্তু কিছুই করা যায়নি। বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। শানুর বাবার মিথ্যে গোঁয়ারতুমির জন্যে এতগুলো জীবন নষ্ট হয়ে গেল। হোয়াট আ ওয়েস্ট!

কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে বসে ছিলাম। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠতে ধরলাম। রোশনির ফোন, "বাবা আমি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া করে রাত নটার ফ্লাইটে সিট জোগাড় করেছি। সেটা ধরতে পারা যাবে তো?"

বিষাদমগ্নতাটাকে ঝেড়ে ফেলে আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ মা, আমি আসছি।"

অনন্যা দাশ পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের হার্শি-তে বাস করেন এবং পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা গল্প এবং উপন্যাস কলকাতার প্রায় সব নামকরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিম্ব

দীপঙ্কর চৌধুরী

।।১।।

এ'গল্প আমার দিদিমার মুখে শোনা।
গল্পটা তাঁর জ্যাঠাইমার।
নাম ছিল তাঁর সৌদামিনী। শুনেছি, অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তিনি।
নয় বছর বয়সে বিয়ে হয়ে বারোতে বিধবা হয়েছিলেন। এ' হলো বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। শহর কলিকাতা তখনও ছিল ভারতের রাজধানী, এবং পৃথিবীব্যাপী 'সূর্য-না-ডোবা' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান শহর!
না, মোহনবাগান তখনও শিল্ড জেতেনি।
উত্তর কলকাতার বনেদী হিন্দুঘর! সারাজীবন একাদশী-টশী নানান বিধিনিষেধের নিগড়ে থাকতে হয়েছে বটে, তবু তিনি এক প্রবল তেজস্বিনী স্বশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন ; সবিশেষ আধুনিকা, মানে যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে। নিজের চেষ্টায় ঘরে বসে সেকালে ইংরিজিভাষাও শিখে নিয়েছিলেন; দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পড়তেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময়ে হাতে রাখী নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে দোরে দোরে ঘুরতে দেখেছেন। জ্যাঠাইমা তখন কিশোরী।
**
দিদিমা আমার নাক বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন, আর কেঁদে ভাসিয়েছিলাম আমি। আমার বয়স তখন নয়।
পিঠে গুম্ করে আদুরে এক কিল মেরে বলেছিলেন দিদা, 'মেয়েমানুষ। অত আওপাতালি হলে চলে? সেকালে তোর বয়সী মেয়েরা.....'
সেই কথায় কথায় তাঁর জেঠিমার কথা উঠেছিল।
এক ঘনঘোর বর্ষার রাতে সেই নমস্যা মহিলার গল্প শুনিয়েছিলেন দিদিমা আমায়।
**
শহর কলিকাতার চৌহুদ্দির মধ্যে হলেও সেকালের মস্ত মস্ত বাড়ির হাতায় বাগান-পুকুর থাকাটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। ওঁদের বাড়ির পিছনেও পাঁচিলঘেরা বড় বাগান ও পুকুর ছিল; সেখানে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশও থাকত, যথায় বাড়ির বৌ-ঝিদের গাছে চড়া বা সাঁতার কাটায় বাধা ছিল না কোন।
সেইখানেই এক বেলগাছে থাকত এক বেম্মদত্যি ।
বেম্মদত্যি জানো?
ব্রহ্মদৈত্য! সব ভূত-প্রেতের সেরা, ব্রাহ্মণ ভূত! গলায় তার লম্বা পৈতে ঝোলানো। সন্ধ্যে হলে খড়ম খটখট করে পুকুরঘাটে নাইতে নামতেন।
'ভূত আবার কাঠের খড়ম পেল কোত্থেকে? সে কি খড়ম পায়ে গাছে চড়ত নাকি?'
বালিকাবধূ সৌদামিনীর প্রশ্ন ছিল, মেয়েলী গপ্পের আসরে।
'তুমি বাপু বড্ড টরটরে, মেজো-বৌ । বেম্মদৈত্তি বলে কথা! তার সম্বন্ধে অমন অকুচল কথা কইতে আছে? রাম রাম।' জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে সেই অদৃশ্য ব্রহ্মদৈত্যের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি।
কিন্তু কথাটা মনে ধরেছিল গদা-র মায়ের। সে ছিল ও'বাড়ির বাটনা-ঝি। মানে শিলনোড়া নিয়ে বসে বসে বাটনা বাটা ছিল তার কাজ। সেকালের বাড়িতে অমন গণ্ডা গণ্ডা ঝি-চাকর থাকত হরেক কিসিমের কাজের জন্যে।

সে একদিন চুপিচুপি সৌদামিনীর কানে কানে এসে বলেছিল, 'হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি মা, আমাদের বড়খুড়ো বেম্মদত্তিকে নাবাতে পারে। তেনার ঘরে বসে ভূত নাচায় । ওঁর কথাতেই সে চলে। আমি দেকিচি! এই দ্যাকো বলতে বলতে গায়ে কাঁটা দিচ্চে আমার।'

দুপুরবেলা একমনে ঘরে বসে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' পড়ছিল সৌদামিনী। মুখ তুলে ঝি-কে বলল, 'তুমি বড় নিকম্মে কথাবার্তা বলো গদার-মা। ভূতকে আবার নামানো বা নাচানো যায় নাকি? ভূত বলে কি সত্যি কিছু হয়?'

জ্যাঠাইমার বাবা ব্রাহ্ম-মনস্ক ছিলেন, কেশব সেনের চেলা।

'রাম রাম রাম রাম। তুমি এমন কথা বলো মেজো, যে ভর দুক্কুরবেলা গা ছমছম করে ওঠে।'

এই বড়খুড়ো বা হারুখুড়ো ছিলেন ওঁর শ্বশুর-স্থানীয় এক বৃদ্ধ। মস্ত বাড়িতে ঠাঁই পাওয়া অনেক আশ্রিতের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। কোণের দিকে একটা ঘরে থাকতেন নিরিবিলিতে। তিনি নাকি এককালে জাহাজে চাকরি নিয়ে দেশবিদেশ ঘুরে এয়েচেন। জাভাদ্বীপে থেকেছেন বহুকাল। শোনা কথা।

এখানে হারুখুড়ো অর্থাৎ হারীন্দ্রনাথ মিত্তির আর জাভাদ্বীপের গল্প কিছু বলতে হয়। আজকের দ্বীপময় রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার এক প্রধান দ্বীপ হলো জাভা।

।।২ ।।

নবম শতাব্দীতে, অর্থাৎ আজ থেকে তেরোশ' বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা দ্বীপে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শৈলেন্দ্র রাজবংশ রাজত্ব করত। মোটামুটি এই সময়েই আমাদের বঙ্গদেশে ছিল পালবংশের রাজত্ব । পালেদের মতোই শৈলেন্দ্র রাজবংশও ছিল মহাযানী বৌদ্ধ । পালেরা বাঙালী, আর শৈলেন্দ্রগণ মূলত ছিলেন উড়িষ্যার মানুষ । শৈলেন্দ্রদিগের সময়ে সেদেশে অসাধারণ সব স্থাপত্যকীর্তি হয়েছিল, 'বরবুদুরের মন্দির' যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধস্তূপ বা মন্দির এটি। আজও সারা বিশ্ব থেকে মানুষ যায় বরবুদুর দেখতে। বিশ্বের এক বিস্ময় হলো এই বরবুদুরের মন্দির।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও যেমন চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট বিদ্যার্থী-প্রকোষ্ঠ দেখতে পাওয়া যায়, বরবুদুরের মন্দিরের ভিতরেও তেমন আছে ছোট ছোট স্তূপ। তাদের গায়ে ঝিল্লির মতো ফুটো ফুটো করা। ভিতরে বসে ধ্যান করবেন যে তপস্বী তাঁর নিঃশ্বাস নেবার সুবিধার জন্য। এ'রকম শ'পাঁচেক স্তূপ আছে । মস্ত বড় চৌহুদ্দি এই মন্দিরের---প্রায় চৌদ্দ হাজার স্কোয়ার মিটার!

**

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এক ডাচ মালবাহী জাহাজে চাকুরী নিয়ে একজন বাঙালী যুবক জাভাদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সময়টা ১৮৮৫ খৃ., তখন সবে সবে বম্বেতে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' স্থাপিত হয়েছে---এই নিয়ে কাগজে কাগজে গুলতানি চলছে খুব। এঁরই নাম হারিণ মিত্তির, আমাদের হারুখুড়ো বা বড়খুড়ো।

ইতিহাসে প্রবল আগ্রহ ছিল এই যুবক হারীন্দ্রনাথের। বরবুদুর মন্দিরের আশেপাশেই আস্তানা গেড়ে বসল সে---ভালো করে ঘুরে দেখবে এই অনন্য মন্দির। শুনেছিল, কোনার্কের মন্দিরের মতোই সূর্যোদয়ের প্রথম আলোকে নাকি বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই মন্দির, তাই একদিন অতি ভোরে মন্দির চত্বরে এসে পৌঁছে গিয়েছিল যুবক হারীন্দ্রনাথ।

সূর্যোদয় হতে হতে তার অপূর্ব আলোকে বিমোহিত সেই যুবক উঁচু গলায় আবৃত্তি করে উঠেছিল,

'ওঁ জবাকুসুম শঙ্কাশম্ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিম্....'

পাশের এক ছোট স্তূপের ভিতরে বুদ্ধমূর্তিটা নড়ে উঠল।
না, ভালো করে চোখ কচলে তাকিয়ে দেখল, মূর্তি নয় , সে ছিল এক তপস্বী বালক । মুণ্ডিত মস্তক। গেরুয়া বসন।
ধ্যান ভেঙে উঠে এসে শুধালো সে,
'আপনি ভারতীয়?'.
ভাষাটা তার খাঁটি সংস্কৃত।
এরপর সেই ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপ হয়ে যেতে দেরি হয়নি হারুখুড়োর, মানে হারীন্দ্রনাথের।
আদতে মণিপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিল সেই বালক, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় কথা বলে। সে ভাষা বাংলার কাছাকাছি। বুঝতে অসুবিধে হয় না। ছেলেটি সন্ন্যাসী হয়েছে বেশিদিন হয়নি।
শুধোয় সে হারুকে, 'আপনি কি আসাম-মণিপুর অঞ্চলে গিয়েছেন কখনও?'
---'ঘর ছেড়ে এতো দূর এসেছ তুমি বালক, মন কেমন করে না কি তোমার ঘরের জন্যে? কে কে আছেন তোমার ঘরে?' হারীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা।

---'মা। একা মা। বড় দুঃখিনী মা আমার।.... মায়ের জন্য মন দুখলে শাঁখ বাজাই আমি। শঙ্খনাদ!' বললে সে।
---'মানে? তাতে কী হয়? বুঝলাম না।' বলেন হারীন্দ্রনাথ।
---'আচ্ছা। বুঝিয়ে দেবো সেটা একদিন তোমারে'.
---কিন্তু আমি তো কালকেই চলে যাব এখান থেকে। আমার জাহাজ ছেড়ে দেবে যে!
--- সে কী! কালকেই? বেশ, চলো তাহলে এখন আমার সঙ্গে।

হারুখুড়োকে নিয়ে বিশাল বরবুদুরের মন্দিরের অলিগলি পেরিয়ে মাটির নিচের সুড়ঙ্গ বেয়ে অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠে এসে উপস্থিত হলো সে বালক সন্ন্যাসী। টিমটিম করে এক ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে সেখানে দিনের বেলাতেও।
না, পরদিনই বরবুদুর থেকে চলে আসা আর হয়ে ওঠেনি হারীন্দ্রনাথের। দীর্ঘকাল থেকে গিয়েছিলেন তিনি জাভাদ্বীপে।
সেখানেই প্রথম ঋদ্ধির পাঠ পেয়েছিলেন তিনি।
'ঋদ্ধি'---বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে আত্মশক্তি বৃদ্ধির শিক্ষা! যেমন, নিজেরই এক দ্বিতীয় রূপের প্রকাশ বা, 'উন্মোচন' বা 'মুক্তি'। মানে, কোনো কারাগার বা শিকলদ্বারা আবদ্ধ না থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি।
এরই মধ্যে বিশেষ এক বিদ্যা হলো 'শঙ্খনাদ'! যে শাঁখ তেমন সুরে ঠিক ঠিক বাজালে হাজার হাজার মাইল দূরে কোনো প্রিয়জনের কানে ঠিক পৌঁছে যাবে তার ধ্বনি।
এবং শিখেছিলেন প্রাচীন এক ইন্দোনেশীয় আর্ট!

পুতুলনাচের ছায়া খেলানো!
কাঠের পাতলা পাত কেটে কেটে এক-দুই বিঘৎ পরিমাণ উচ্চতার পুতুল-মানুষ বানানোঃ--রাম-রাবণ-সীতা ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতীয় পুতুলনাচের মতো উপর থেকে দড়ি দিয়ে নয়, পিছনে লাগানো হাতল দিয়ে সেগুলো নাচানো, আর আলোর সামনে ধরে দেওয়ালে তার ছায়া ফেলা।
ছায়াটাই দ্রষ্টব্য, সেটাই আর্ট, পুতুলগুলো নয়।
এ'পুতুল-নাচানোর নাম 'ওয়েয়াং ক্লিতিক' ।
আমাদের এ'গল্পে এর কথা আবার ফিরে আসবে

।। ৩ ।।

হরিপদ ছিলেন আমার দিদিমার ভাই ,এ'গল্পের সময়ে তার বয়স সাত-আট বছর হবে। জেঠিমার বড্ড নেওটা ছিল সে, সর্বদা তাঁর আঁচল ধরে ধরে ঘুরতো । তার আবার ভূতপ্রেতে ছিল অগাধ বিশ্বাস। আর তার জন্যে জেঠির কাছে পিঠে গুম্ গুম্ কিল-ও খেতো কম না।

একদিন বিকাল থেকে আকাশ কালো করে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে।
সৌদামিনী যথারীতি তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে বঙ্কিমী নভেল পড়ছেন।
চুপি চুপি পা টিপে টিপে তাঁর ঘরে ঢুকে হরিপদ বলল, 'জেঠিমা, একটা জিনিস দেখবে? এসো না, এসো।'
'তুই দুপুরবেলায় আঁক কষিসনি? কী করছিস সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে?'
'করেছি। করেছি। এখন চল না। দেখবে চল নিচোয় একটা জিনিস.....'---গলায় তার একটা হিসহিসে উত্তেজনা!
একতলার এক্কেবারে কোণের দিকে হারুখুড়োর ঘরখানা একটেরে, টালিখোলা দেওয়া, একটু আলাদা ।
জেঠির হাত ধরে টেনে নামাতে নামাতে মাঝ সিঁড়িতে রুকে গেল হরিপদ।

আঙুল তুলে দেখালো সেই ঘরের টালির একটা ফোকর দিয়ে ভিতরের দেওয়ালে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত সব দৃশ্য। নড়াচড়া করা ছবি। যেন জীবন্ত। কিম্ভুতকিমাকার মুখ-দেহ-মানুষের মতো দেখতে ছবি নড়ছে দেওয়ালে। মুকুট পরা রাজা। তীর ধনুক হাতে রামরাবণের যুদ্ধ!! ইত্যাদি ইত্যাদি।
অদ্ভুত তো!

মনে রাখতে হবে, এই ঘটনাকাল ১৯০৯-১০ খৃ. নাগাদ। 'সিনেমা' বা, 'বায়স্কোপ' নামক বস্তুটি ভালোভাবে ভারতে আসতে তখনও অনেক দেরি আছে; নামই শোনেনি কেউ।
ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল হরিপদ। ফিসফিস করে বলল, 'তুমিই বলো জেঠিমা, ওগুলো ভূত নয়? এইজন্যেই গদার-মা বলেছিল যে বড়খুড়ো ভূত নাবাতে পারে.....'
ভড়কে সৌদামিনীও গিয়েছিলেন, কারণ এ'রকম নড়ন্ত ছবি তিনিও আগে কখনও দেখেননি। তবু সাহস সঞ্চয় করে দাবড়ে উঠলেন, 'থাম্ তুই '।
 তারপর মাথায় ঘোমটাটা টেনে নিয়ে সেই দরোজায় গিয়ে খটখটালেন, 'খুড়োমশায়! খুড়োমশায় ঘরে আছেন? একবার খুলুন তো দরজাটা।'

বালক হরিপদ জেঠির আঁচল ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে ভয়ে।
'কে? মা-জননী?' দরজাটা খুলে দিলেন বৃদ্ধ হারীন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে আছেন সামনে।
খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে তীক্ষ্ম দৃষ্টি হেনে দেখা গেল একটা কাঠের স্টুলের উপরে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে একখানি। আর বুড়োর তক্তপোষের উপরে কাঠের খেলনার মতো মেলা জিনিস টিনিস পড়ে রয়েছে , দড়িদড়া সহ । দেওয়ালে একটা সাদা কাপড় টাঙানো রয়েছে।

কড়কড়াৎ করে সশব্দে একটা বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও।

কোন কথা না বলে মনে মনে 'বেশ বেশ' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে ফিরে এলেন সৌদামিনী, অবাক হারুখুড়োকে নিচে পিছনে ফেলে।
যা দেখার তা দেখা হয়ে গেছে ওঁর।
না, সেই ঘরে অন্য কোন মানুষ লুকিয়ে ছিল না।

।। ৪ ।।
এর কিছুদিনের মধ্যে ওঁদের বাড়িতে রৈ রৈ পড়ে গেল!
কী, না ছোট-তরফের বড় খুকির বে হবে। মানে বিয়ে, বিবাহ।
ওঁদের তরফে এটাই প্রথম বড় কাজ। তাই রমরমাতে কার্পণ্য যেন কিছু না হয়। বড়লোকের বাড়ি কিনা।
পাত্রীর বয়স সাত। অপূর্ব সুন্দরী।
পাত্র আই. সি. এস. ফেল হলে কী হবে, বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ছে তখন । সামনের অঘ্রানে এসে বসবে বিয়ের পিঁড়িতে। উচ্চ কুলীন ঘর তাদের!
পরের পর পাত্রপক্ষের এ'-ও'-সে দলে দলে এসে এসে কনে দেখে যাচ্ছে। তাদের খাওয়ান-দাওয়ান হচ্ছে খুব। বিয়েতে ভিয়েন বসবে, তার লোকজন আসছে। আসছে দলে দলে শাড়ি-গহনার বিক্রেতারা। স্যাকরারই আনাগোনা চার-পাঁচ দলের। দেড়শ' ভরি সোনার গহনা লাগবে।
সেকালে অবিশ্যি সোনার ভরি ছিল উনিশ টাকা [আজ যেটা একষট্টি হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে]!!**
বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে।
কার্তিক মাসের শেষ। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।
হঠাৎ একদিন একটা ভয়ংকর ঘটনায় শাশুড়ির মাথায় হাত পড়ল!
প্রথম প্রথম কথাটা চেপে যাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু চাপা থাকল না।

গিন্নির কষি থেকে তোষাখানার চাবি গায়েব হয়ে গিয়েছে !!
'তোষাখানা' অর্থে দোতলার সেই বড় ঘরটা যেখানে থরে থরে সিন্দুকে বিয়ের সমস্ত গহনা, নূতন বাসন-কোসন থেকে দামী দামী শাড়ি ইত্যাদি সবকিছু রাখা আছে।
শিরে বজ্রাঘাত। কী হবে এখন?
চোর ধরার চিরাচরিত পদ্ধতি 'বাটি চালানো', 'কাঠি ভাঙা' বা 'চাল চিবানো'---কিছুই করা যাবে না, কারণ তাতে ঘটনাটা পাঁচকান হয়ে যাবে , এবং বারবাড়ির কর্তারা জানতে পেরে গেলে কুরুক্ষেত্তর হবে। মেয়েমহলেই গৃহকর্ত্রীর অতি নিকট দু'তিনজন মাত্র জানলো চাবি চুরির ঘটনাটা।
'তুমি মা একজন গুণিন ডাকো', বড় বৌমার পরামর্শ।

সেটা মনে ধরলো গৃহকর্ত্রীর। কিন্তু নির্ভরযোগ্য গুণিনই বা এক্ষুনি এক্ষুনি পাওয়া যায় কোত্থেকে? সময় যে আর নেই।
'কেন? তেমন গুণী মানুষ তো আছেন তোমাদের নাকের ডগাতেই', ঘরের এক কোণ থেকে নিম্নস্বরে বললেন সৌদামিনী ।
সকলে অবাক হয়ে তাকালো তাঁর দিকে। তিনি কিনা বিধবা মানুষ ছিলেন, তাই বিয়েশাদীর কথায় তাঁর না-থাকাটাই দস্তুর ছিল সেকালে। তবু, সৌদামিনী যেহেতু 'পড়াশোনা করা' মহিলা ছিলেন তাই তাঁর কথাকে মান দিত সকলেই।

‘কে সে?’
‘পরে বলব’।
‘পরে বলবে কী গো মেজো।? শিয়রে শমন এখন.....’। শাশুড়ি বলেন।

‘পাঁচকান করাটা উচিত হবে না, কারণ আমি নিজেই বড্ড নিশ্চিত নই’। সৌদামিনীর বক্তব্য।
‘তুমি আমাকে বল। আমিই সিদ্ধান্ত নোব। ওরে, তোরা সব পাশের ঘরে যা তো একটু। মেজোর সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।’
সকলে বেরিয়ে যেতে নিচুস্বরে শাশুড়ির কানে কানে জানালেন সৌদামিনী তাঁর পরিকল্পনা।
শুনে চোখ কপালে উঠল গৃহকর্ত্রীর।
‘বলো কী গো। মেয়েমহলে পুরুষ মানুষের পদার্পণ...’
---‘এ’ছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই মা। ভেবে দেখুন। তাছাড়া, তিনি বৃদ্ধ মানুষ। পিতৃতুল্য!’

।।৫ ।।
এরপর বৃদ্ধ হারুখুড়োকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দোতলায় খোদ গৃহকর্ত্রীর কক্ষে আসতে দেখা গেল। কক্ষনো এই প্রকার তলব আসেনি তাঁর কাছ থেকে। এখন দুই খাস-ঝি পাহারা দিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়ে গেল তাঁকে গৃহিনীর ঘরের সামনে।
চিক ফেলা রয়েছে ঘরের মাঝ বরাবর। ‘চিক’ মানে এক ধরনের কাপড়ের বা লেসের পর্দা। ছাদ থেকে ঝোলানো থাকত। যার পিছনে মহিলারা আলাদা বসতেন। তাঁদের পরিষ্কার দেখা যেত না।
চিকের সামনে একটা চেয়ারের এসে বসলেন বৃদ্ধ হারীন্দ্রনাথ---হারুখুড়ো।

---‘আপনি ভূত নামাতে পারেন? ব্রহ্মদৈত্য?’ সপাট প্রশ্ন গৃহকর্ত্রীর।
---‘আজ্ঞে না।’ ওঁর সরল স্বীকারোক্তি।
---‘সকলে যে বলে?’
---‘ভুল বলে। ভূত-টুত বলে আসলে কিচ্ছু হয় না’। বললেন তিনি।
---‘তাহলে সেই যে কয়েক মাস আগে কালবোশেখির বিকেলে আপনার ঘরের দেওয়ালে অনেক লোকজন রাজাগজার নড়াচড়া করা ছবি দেখেছিলাম.....’ এ’গলাটা সৌদামিনীর। চিকের অন্তরাল থেকে ভেসে এলো।
---আজ্ঞে সেটা ছিল ‘ওয়েয়াং ক্লিতিক’!
---মানে? সে আবার কী? গৃহকর্ত্রীর অবাক প্রশ্ন।

---কোন ধরনের পুতুলের খেলা কি? পাপেট? ‘কাঠপুতলী’? আলো দিয়ে দেওয়ালে তাদের ছায়া ফেলে ফেলে.....। সৌদামিনীর জিজ্ঞাসা।
কোনো এক বিলিতি পত্রিকায় এ’সম্বন্ধে পড়েছিল সে।
---হ্যাঁ মা-জননী। জাভাদ্বীপে থাকাকালীন আমি শিখেছিলাম এই অপূর্ব আর্ট। ছায়াচিত্র। এখনও মাঝে মাঝে ঘরে বসে অভ্যাসটা বজায় রাখি।

---কিন্তু খুড়োমশাই, এই 'ওয়েয়াং ক্লিতিক' দিয়ে যে আপনাকে আজ মায়ের মান বাঁচাতে হবে, চাবি-চোরকে ধরে দিতে হবে। সৌদামিনী বললেন।
---সে কি মা?! সেটা কী করে সম্ভব?
সৌদামিনী এবার হারুখুড়োকে বুঝিয়ে বললেন পরিকল্পনাটা।

।। ৬ ।।
সন্ধ্যাবেলা একতলার বড় একটি ঘরে গোপন আসর বসেছে।
মাত্র ছয় জন অনুমতি পেয়েছে সেথায় ঢোকবার।
একদিকের দেওয়াল জুড়ে সাদা পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সামনে মাটিতে বসে আছে গিন্নির খাস দুই ঝি ও দুই চাকর, পাশের দুই স্টুলে সৌদামিনী ও স্বয়ং গৃহকর্ত্রী বসে আছেন।
কড়া হুকুম রয়েছে, কেউ যেন পিছন পানে না তাকায়।
পিছনে একটা টেবিলের উপরে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। তার সামনে হারুখুড়ো বসেছেন তাঁর কাঠপুতলীর সরঞ্জাম নিয়ে। সেটা কিন্তু আর কেউ জানে না।

ইন্দোনেশিয়ান আর্ট 'ওয়েয়াং ক্লিতিক' !
এইবার দেওয়ালে নড়া ছবি ভেসে উঠতে শুরু করল।
মানদা-ঝিয়ের দাঁত ঠকঠকানি শুরু হয়ে গেল। গৃহকর্তী-সহ বাকিদেরও অবস্থা সুবিধের নয়। ভয়ে কাঁপছে সবাই। কারণ দেওয়ালে কালো কালো ভূতেরা খেলা করতে নেগেচে যে!
সৌদামিনী বলে উঠলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। সামনের দিকে দেখ তোমরা। যে সৎ তার কিচ্ছু হবে না, কিন্তু যে চুরি করেছে দেরাজের চাবিটা....'

সাদা পর্দার উপরে তখন ভেসে উঠছে ছায়াচিত্র। একজন মানুষ। আর একজন বুড়ো মানুষ। নেড়া। টিকি। [কে? ব্রহ্মদৈত্য নয় তো?]। হাঁটছে তারা। পরস্পর মারামারি করছে। আজকের দিনে হলে 'ভূতের রাজা দিলো বর'-এর নাচের দৃশ্য বলে মানা যেত।
এবার এক মেয়েমানুষের চিত্র । শাড়ি বা ঘাগরা পরা। সে এগিয়ে আসছে। তার হাতে ওটা কী? চাবি নাকি? ছায়া নড়ছে দেওয়ালে। ঠাহর হচ্ছে না ঠিক করে। সে এগিয়ে আসছে। সামনে একটা সিন্দুক। খুলবে নাকি সে সিন্দুকটা?
বন্ধ হয়ে গেল ছবি আসা, নড়া। থেমে গেল সব।

সৌদামিনীর গলা ভেসে এলো এবার, 'সৎ মানুষের ভয় নেই। কিন্তু চাবি যে চুরি করেছ---ঐ বেহ্মদত্যি এসে মটকাবে তার ঘাড়। আজ রাত্তিরের মধ্যেই। সব জানা আছে, ধরা আছে দেখ ঐ ছবিতে।
গিন্নিমায়ের ঘরের শ্বেতপাথরের গোল টেবিলটার উপরে যেন আজ মাঝ রাত্তিরের মধ্যেই চাবি ফেরৎ আসে। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না। কিন্তু চাবি ফেরত আসা চাই।'
ব্যস। বন্ধ হয়ে গেল সৌদামিনীর গলার স্বর।
ওঁর যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে।

**

হ্যাঁ, এসেছিল ফিরে সে চাবি।

বেঁচেছিল গিন্নিমায়ের ইজ্জত, ও ধনমান।

‘কিন্তু চোর? চোরটা কে ছিল?’ দিদিমার গল্পের শেষে আমার প্রশ্ন ছিল।

‘সেটা নিয়ে তোমার দরকার কি বাপু?’, দিদা বলেছিলেন, ‘গিন্নিমায়ের খাস ঝি-চাকরদের মধ্যেই কেউ নিয়েছিল চাবিটা---সেটা তো পরিষ্কার। সে অনুমানটুকু করা কঠিন ছিল না, কারণ আর কারও তো সুযোগই ছিল না ঐ ঘরে ঢোকবার । তাদেরই তো বসানো হয়েছিল মাটিতে, দেওয়াল-চিত্রের সামনে। তাদের মধ্যেই এক চাকরকে তো আর তার পরের দিন থেকে দেখতেও পাওয়া যায় নি। ব্রেহ্মদত্যির ঘাড়-মটকানোর থেকে বাঁচতে ভয়ে ভয়ে চাবি ফেরত দিয়ে শেষ রাত্তিরেই বাড়ি ছেড়ে চম্পট দিয়েছিল সে।

জাভাদ্বীপের পাপেট-আর্ট ‘ওয়েয়াং ক্লিতিক’ –এর প্রয়োগ করে চোর ধরে দিয়েছিলেন আমার জেঠাইমা। নমস্য মানুষ ছিলেন। ’

সেই মহান নারীর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন দিদিমা।

বলতে বলতে প্রচণ্ড ঝলক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আর কড়কড়াৎ করে বাজ পড়ল একটা।

দিদিমা বলে উঠলেন, ‘আহা রে, উপর থেকে জেঠাইমা শুনছিলেন গো এ’গল্প।

সৌদামিনী মানে জানো তো?

সৌদামিনী মানে তড়িৎ, বিদ্যুৎ!’

দীপঙ্কর চৌধুরী (জ. ১৯৬১)শিশুসাহিত্যিক, গ্রন্থ-সমালোচক ও বঙ্গানুবাদক।

প্রথম বাংলা ওয়েবজিন ‘পরবাস’-এর গ্রন্থ-সমালোচনা কলামটি লিখছেন একাদিক্রমে আজ চৌদ্দ বৎসর; ছদ্মনামে।

প্রকাশিত গ্রন্থঃ ‘ডাইনি’ , ‘মায়াতোরঙ্গ’ , ‘এক্কা-দোক্কা’ ‘কলোনিয়াল কলকাতার ফুটবল’ [অনুবাদ] , ‘নটে মিঞার গুপ্তধন’ [গ্রাফিক নভেল] .

লিখেছেন ‘পরবাস’, ‘কিশোর ভারতী’, ‘অঞ্জলী’ , ‘জয়ঢাক’, ‘স্টেটসম্যান’ (বাংলা) প্রভৃতি পত্রিকায়।

কলকাতার হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী; পেশায় ব্যাঙ্কার (অধুনা অবসৃত)।

ভুল পথে ?

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

পটভূমিকা: এই গল্পের সময় ষাটের দশকের শেষের-দিক থেকে সত্তরের দশকের সুরুর আমেরিকা বা ইউএসএ।

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে আমেরিকাতে পাস হয়েছিল এক বিখ্যাত ইমিগ্রেশন বিল !

এর আগে ইউরোপিয়ানরাই বেশী সুযোগ পেতেন ইমিগ্রেশন নিয়ে এদেশে আসবার। এই নতুন আইন এশিয়া থেকে বহু মানুষের আমেরিকাতে প্রবেশের পথ খুলে দিল।

অনেকেই তখন আজন্মের পরিচিত দেশ, ও আপন লোকদের ছেড়ে পাড়ি দিলেন এই সুদূর প্রবাসে, নিজেদের স্বপ্ন পূরণের আশায় । এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ভারতীয়রাও ছিলেন ।

এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেতে চলেছিল কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন ।

বিশ্বের ইতিহাসে উনিশশো ষাটেরএর দশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ছিল এক উত্তাল সময় । তখন অনেক আমেরিকানরা গণতান্ত্রিক আদর্শ কে সম্পূর্ণ ভাবে সফল করবার নেশায় মেতে উঠেছিলেন। এই গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বহু কাল ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমান সামাজিক, ও অর্থনৈতিক অধিকার পাননি ।

আমেরিকার মানুষ চাইছিলেন সম্পূর্ণ সামাজিক, আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সাম্য । মহিলাদের দাবি ছিল চাকরীর ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার এবং পারিশ্রমিক পাবার। শান্তি-বাদীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলেন যুদ্ধের অবসানের জন্য ।

বড় বড় শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছিল অশান্তির আগুন; জাতিগত দাঙ্গা ও অরাজকতা । আফ্রিকান আমেরিকানরা তাদের সারাজীবনের দারিদ্র্য ও সামাজিক দুরবস্থার জন্য এতকালের চেপে রাখা ক্ষোভ আর হতাশার সোচ্চার প্রকাশ করতে সুরু করেছিলেন ।

বেশির ভাগ ভারতীয়রাই তখন আমেরিকাতে আসছিলেন নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করতে। এর মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ।তাই কর্মজগতে তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ।

আমেরিকাতে ভারতের তুলনায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল অনেক বেশী, নতুন আসা মানুষদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারর মেধাবী সন্তান। এদিকে আমেরিকান ডলারের দামও বাড়ছিল ক্রমাগত, অনেকেই ভাবতেন একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপরে দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই ভাবনাকে কাজে পরিণত করা অত সহজ ব্যাপার ছিলনা ।

তখনকার দিনে এশিয়ান সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষ হয়ে আমেরিকার রোজকার জীবনে একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের মত সমান অধিকার পাওয়া কি সম্ভব ছিল? একটা কিসের অভাব বোধ যেন সব সময়েই মনে থাকত ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই টালমাটাল পরিস্থিতির প্রভাবও বিচলিত করতো এই সব নতুন অভিবাসীদের জীবনে ।

এইভাবেই তখন নতুন আসা ভারতীয়দের জীবনের অনেক নতুন গল্প গড়ে উঠছিল।

এমনই এক গল্পের কথাই আজ লিখতে বসেছি ...

রিমি ও তার স্বামী অমিত সেটল করছিল নিউ ইয়র্ক স্টেটের অ্যাপালাচিয়ান পাহাড়ের কোল ঘেঁষা একটা ছোট্ট শহরে । শহরটা গড়ে উঠেছিল আলেঘেনি মালভূমির উপরে , আর এর দুইদিক দিয়ে বয়ে চলেছিল দুই নদী; শেনাঙ্গো আর সাসক্যুহানা ।

অমিতের এই নির্জন গাছপালা ঘেরা পাহাড়ি শহর আর এখনকার নতুন গড়ে উঠা ইউনিভার্সিটিটা খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল যে এখানে নিজের মত করে তার গবেষণার কাজ চালাতে পারবে । সবচেয়ে বড়কথা অমিত আমেরিকার বড় শহরগুলির থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল । আগে থাকত ফিলাডেলফিয়াতে, সেখানকার নামি ইউনিভার্সিটির চাকরি তাই সে এককথায় ছেড়ে দিয়েছিল, ভেবেছিল ফিলাডেলফিয়াতে থাকা আর নিরাপদ নয় , ক্রাইম আর বিশৃঙ্খলতা তখন দিন দিনই বাড়ছিল সেখানে।

অমিতের নতুন জায়গার ইউনিভার্সিটিতে ভারতীয় প্রায় কেউ তখন ছিলেন না বললেও চলে । তাতে অবশ্য অমিতের বিশেষ অসুবিধে হোতনা কারণ সে নিজের দেশ ও আপনজনদের ছেড়ে খুব কম বয়সেই স্কলারশিপ যোগাড় করে আমেরিকায় আসে পি এইচ ডি করতে , সে চাইত পড়াশুনো আর রিসার্চের কাজে ডুবে থাকতে, এর বাইরে কোনকিছুতেই তার বিশেষ আগ্রহ ছিলনা ।

রিমি র মন চাইত কিছু অন্যরকম পরিবেশ তবে সে চেষ্টা করছিল নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে নিতে ।

অমিত কখনও সপ্তাহের শেষে তার আমেরিকান কোলিগদের নিমন্ত্রণ করতো । রিমি কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে কিছু রান্না করতো । ওঁদের স্ত্রীরা ভীষণ খুশি হতেন রিমির অপটু হাতের তৈরি চিকেন কারি খেয়ে । নিপুণ হাতে লিখে নিতেন রেসিপি, প্রশংসা করতেন রিমির শাড়ীর । মাঝে মাঝে শুক্রবার সন্ধ্যায় ওরা দুজনে কোনও একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যেত এইসব নতুন বন্ধুদের সঙ্গে।

এখানে গাড়ি ছাড়া এক পাও কোথাও যাওয়া যেতনা । দোকান বাজার সবকিছুই দুরে দুরে, আর পাবলিক বাসও বাড়ীর কাছাকাছি আসেনা ।

ওদের একটাই গাড়ি, সে টা নিয়ে অমিত সকালেই চলে যেত ইউনিভার্সিটি তে । রিমি অনেক চেষ্টায় সদ্য পেয়েছে তখন ড্রাইভার্স লাইসেন্স । প্রথমদিকে অতটা সাহস হয়নি যে ভোরে উঠে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আধঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে অমিতকে ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে এসে তারপর সারাদিন গাড়িটা ব্যবহার করে আবার তাকে ফেরত নিয়ে আসবার ।

ওদের অ্যাপার্টমেন্ট টা ছিল ছবির মত , তবে বাচ্চাদের পার্ক বেশ কিছুটা দুরে ,ঠিক হাঁটাপথ নয় ,বিশেষ করে ছোট বাচ্চার পক্ষে, আবার শীতও এখানে বেশি, জায়গাটা স্নো-বেল্টের কাছা কাছি। রিমিদের দুবছরের মেয়ে ঝুম খালি বাইরে বেরুতে চাইত ।এই দিকটা ছিল খুব নির্জন ও নিরাপদ । ওদের অ্যাপার্টমেন্টে অন্য অনেক বাসিন্দা ছিলেন ঠিকই ,মৌখিক আলাপও হয়েছিল কারুর কারুর সঙ্গে তবে তখনও ঠিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি ।

এই বাড়ী তখন বদল করাও সম্ভব হয়নি কারণ একবছরের লিজ ছিল, আর অমিতের সময়ও ছিলনা নতুন বাড়ী খোঁজবার ।

রিমির মনে জমতে সুরু হয়েছিল একটা অভাববোধ; সে ভাবত কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁকি আছে এদেশে, চারিদিকে এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য , নিজের দেশের তুলনায় এত বৈভবময় জীবন, তবু তার কেন এমন লাগত, সে নিজেও বুঝতনা ।
রিমি র মাথায় ঘুরত নানান চিন্তা, সে মনে করত যে এদেশে টিভি, রেডিও, আর খবরে কাগজে স্বাধীনতা আর সাম্য নিয়ে এত যে আলোচনা চলছে, কিন্তু সেসব কাদের জন্য? ওর নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা কতটুকু আছে এখানে? সে তো নিজের গরীব দেশে এর চাইতে অনেক বেশী স্বাধীন ছিল ।
এই সময়ে অমিতের আমন্ত্রণ এল তার আগের ইউনিভার্সিটি থেকে একটি কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য । অমিত রিমিকেও সঙ্গে যেতে বলল এই ভেবে যে রিমির খানিক বেড়ান হবে আর একঘেয়েমিটাও কাটবে ।
রিমির আসার বিশেষ ইচ্ছে ছিলনা, কারণ অমিত খুবই ব্যস্ত থাকবে, আর সে একা একা ছোট মেয়ে নিয়ে কোথায় বেড়াবে? সেই তো হোটেলের ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে । তবে সে রাজি হয়েছিল এইজন্য যে ফিলাডেলফিয়া ছিল তার ভাল লাগার শহর।
গাড়িটা সেদিন যখন পশ্চিম ফিলাডেলফিয়ার শেরাটন হোটেলের সামনের গেটের কাছে এসে থামল তখন বিকেল প্রায় শেষ । সেপ্টেম্বর মাসের বেলা এর মধ্যেই ছোট হতে সুরু করেছিল, তখন শরত কাল বলে চারিদিকের গাছপালাগুলি নানান রঙে রাঙিয়ে উঠেছিল আর শেষ বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় হলুদ, লাল, কমলা রঙের পাতাগুলোকে যেন আরও ঝলমলে দেখাচ্ছিল।

এই শহরেই সুরু হয়েছিল রিমির আমেরিকার জীবন । অমিতের সঙ্গে বিয়েটা সম্বন্ধ করে আর খুব তাড়াতাড়ি সময়ের মধ্যে ঘটেছিল । রিমির মায়ের ইচ্ছে ছিল, মেয়ে বিয়ের পরে কলকাতা শহরেই থাকবে ,সময়ে অসময়ে তাকে পাশে পাবেন । এদিকে রিমিকে হাতছানি দিয়েছিল বিদেশ, যেখানে তার কিছু কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি র বন্ধু ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছিল পড়াশুনোর জন্য ,আর তার মনে গড়ে উঠেছিল আমেরিকার উজ্জ্বল জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা । অল্প বয়সের উন্মাদনায় সে এককথায় তার কাছের মানুষগুলি আর পরম ভালবাসার শহর কলকাতাকে ছেড়ে আসতে দুবার ভাবেনি ।

প্রথমে এসে ফিলাডেলিয়াতে শহর টা তার বেশ ভাল লেগেছিল।। অমিতের ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের পাশেই ছিল ওদের অ্যাপার্টমেন্ট । বাড়ীটাও রিমির মন্দ লাগেনি। পুরনো বাড়ী, কাঠের তৈরি, বিশাল বিশাল তিনখানা ঘর । খুব উঁচু সিলিং, রান্নাঘরটাও বেশ বড় ,বাড়ীর আরেক প্রান্তে । রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখা যেত ইউনিভার্সিটির পিছনের দরজা, রিমি দেখতে পেত বাড়ী থেকেই অমিত যখন সন্ধ্যাবেলা কাজের পরে বাড়ী ফেরার জন্য বেরুত।
আর একটা ভীষণ আনন্দের ব্যাপার ছিল ওখানকার লাইব্রেরির সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্ট, বাংলা বইতে ঠাসা, যত ইচ্ছে নিয়ে পড়া যায় । রিমি ছোটবেলা থেকে গল্পের বইয়ের পোকা, পড়ার বইয়ের তলায় গল্পের বই লুকিয়ে পড়ার চিরকালের অভ্যাস ছিল তার । তবে এত গল্পের বই একসঙ্গে সে কখনও হাতে পায়নি । এই প্রাপ্তি তাকে অভিভূত করেছিল ।
ফিলাডেলিয়ার বাঙালী সমাজেও রিমির মেলামেশার ইচ্ছে ছিল । তবে অমিত বয়সের তুলনায় বেশী গম্ভীর, সে অমিশুক নয় তবে দূরত্ব রেখে মেশে । রিমির স্বভাব প্রাণের কথা উজাড় করে বন্ধুকে বলা । কিন্তু এই সমাজ রিমির পরিচিত জগতের চেয়ে একটু অন্যরকম । তাই রিমিও এই ব্যাপারে সংযত হতে শিখছিল।

রিমি সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিল যখন অমিতের এক কোলিগের স্ত্রী রিমির জন্য যোগাড় করে দিয়েছিলেন একটি অস্থায়ী চাকরী , সেটা ছিল একটি প্রাইভেট বোর্ডিং-স্কুলে, দশ থেকে বার বছরের ছেলেদের জন্য । এদের সরিয়ে আনা হয়েছে বাড়ী ও পরিবেশ থেকে কারণ এদের ভিতরে দেখা গিয়েছে অপরাধ প্রবণতা , ছোটবেলা থেকেই এরা সুরু করেছে আইন ভাঙতে, চুরি ছিনতাই এইসব কাজে বড় ছেলেদের সাহায্য করতে ।

এই রিফর্ম স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল এই সব ছেলেদের বিপজ্জনক ও অনিষ্টকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সুস্থ পরিবেশে রেখে rehabilitate বা পুনর্বাসন. করা ,এবং ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা স্বাভাবিক জীবনের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

রিমির কাজ স্কুলের সাবজেক্ট গুলো পড়ান । রিমির প্রথম থেকেই এদের ভাল লেগে যায় । ছাত্রদের নামগুলোও তার কানে ভারি মিষ্টি লাগে; লুকাস, লিও. অ্যান্থনি, রামেল, আরও কত কি সব নাম। সব মিলিয়ে আট জন এক একটি ক্লাসে । রিমি তো আনন্দে অভিভূত এমন সুযোগ পেয়ে । তবে অমিত প্রথমে কিছুতেই রাজি ছিল না রিমিকে এই ধরনের কাজ করতে দিতে ,কারণ তার মতে এইরকম পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা রিমির পক্ষে বিপদজনক । তবে সহকর্মীর স্ত্রীর উৎসাহের উপর অমিতের আপত্তি বিশেষ টিকলোনা । ক্যারোলিন এই স্কুলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই স্কুলের প্রধান সোশাল ওয়ার্কার ।

রিমির জীবনে এসেছিল এক অজানা আর অপরিচিত অধ্যায় ।একটা ঘোরের মধ্যে কাটছিল তার দিনগুলো ।এই জ্যুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্ট দের মধ্যে সে দেখতে পাচ্ছিল অপার সম্ভাবনা, এদের চোখে সে দেখেছিল পবিত্রতা,আর জ্ঞানের তৃষ্ণা ।

পড়ানোর মাঝে মাঝে অনেক গল্প হোতো, দুপক্ষই জেনেছিল একে অপরের জীবনের কথা ।

রিমির গলায় সব সময় থাকত তার মায়ের দেওয়া সোনার হার । ছেলেগুলি তাকে সোনা পরে আসতে সাবধান করত, বলত, এই হারের জন্য রিমি একদিন বিপদে পড়ে যেতে পারে । কারণ আগেকার অভিজ্ঞতার জন্য এরা সোনা কি জিনিষ জানত । রিমি ভাবত, যে এরা সোনা চুরি করেছে ঠিকই , কিন্তু চাপে পড়ে করেছে আর এদের তো কেউ শেখায়ও নি কোন টা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় । রিমির কাজই তো শিক্ষিকা হিসেবে এদের মনে ঠিক কাজ আর ভুল কাজের তফাৎ জাগানোর।

রিমি জেনেছিল যে এরা ছোট থেকেই স্কুল কামাই করতে অভ্যস্ত, জোর করে স্কুলে পাঠাবার জন্য কেউ নেই । অনেকের জীবনেই বাবারা অনুপস্থিত ,হয়তো বা তারা জেলে বন্দী। অনেকেই মা বা দিদিমার কাছে থাকে ।দরিদ্র পাড়াগুলির স্কুলও হয় নিম্নমানের কারণ স্কুল চালানর বেশীর ভাগ খরচই আসে সম্পত্তির কর বা ট্যাক্স থেকে । আর গরীব পাড়ার ভাঙা চোরা বাড়ীগুলোর ট্যাক্স তো সামান্য।

রিমি পড়ানোর মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করত এদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে শুভ-চেতনা, অধ্যবসায় আর একটা সুস্থ জীবনের স্বপ্ন ।

ক্যারোলিন রিমিকে প্রথমদিকে কিছু দিন রিমিকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে যেতেন ,পরে রিমি পাবলিক বাসে যাতায়াত করত ।পশ্চিম ফিলাডেলফিয়ার একটি কুখ্যাত পাড়াতে ছিল স্কুলটা, ওখানকার রাস্তাঘাট বিশেষ নিরাপদ ছিলনা তখন । শোন যেত অনেক রকম গ্যাং ছিল সেখানে । টিচাররা ও অন্যান্য স্টাফ সাধারনতঃ গাড়ী চালিয়ে আসতেন স্কুলে। সিকিউরিটির লোকজন থাকত স্কুলের গেটে । আর বাসটা দাঁড়াত স্কুলের প্রায় সামনে তাই রিমির মতে তার এখানে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা কিছুই ছিলনা ।

কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই রিমিকে দিতে হোল কাজে ইস্তফা, কারণ অমিত একটি ছোট শহরের অন্য ইউনিভার্সিটিতে চাকরী খুঁজে নিল । সে আর থাকতে চাইলনা ফিলাডেলফিয়াতে।

তারপর কেটে গেছে বছর তিনেক, আবার সেই ফিলাডেলফিয়া , রিমির অনেক ভাল লাগার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই শহরের সঙ্গে ।

পরের দিন সকাল সকাল অমিত বেরিয়ে গেল তার কনফারেন্সে, বলে গেল যে তার ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে , শহরের অনেক জায়গায় ছোটখাটো দাঙ্গা চলেছে কালকেও , রিমি যেন মেয়েকে নিয়ে হোটেলের ভিতরে আরামে থাকে । সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সবাই মিলে একটু দূরের ভাল এরিয়ার কোন থাই বা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ তে খেতে যাওয়া যাবে ।

ফিলি বা ফিলাডেলফিয়া ষাট ও সত্তরের দশকে খুব অন্যরকমের শহর ছিল, তখন দেখা যেত এক একটি স্ট্রিট গ্যাং, শহরের কোন কোন অংশের উপর আধিপত্য করত ।এদের ছিল নিজেদের দলের প্রতি প্রচণ্ড আনুগত্য, এবং কোন সদস্য যদি বিশ্বাস ভাঙত তার প্রতি নির্মম হতে গ্যাঙের অন্যান্যরা দ্বিধা করত না ।

বিরোধী দলের সঙ্গে এদের রক্তাক্ত সংঘর্ষ প্রায়ই লেগেই থাকত । একবার গ্যাঙে ঢুকলে আর নাকি ছাড়া যেতনা গ্যাং। যেখানেই পালিয়ে যাও গ্যাং এর লোকেরা তোমাকে ঠিক খুঁজে নিয়ে এসে শাস্তি দেবে, এরা এমনই নিষ্ঠুর । পুলিশও তখন নাকি কিছু করতে পারবেনা । এইসব কথা লোকমুখে শোনা যেত ।

মেয়ে ভালভাবে ঘুমোয় নি সারারাত, পরেরদিন ওরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সকালের দিকে, তাই ঘুম থেকে উঠতে প্রায় লাঞ্চের সময় হয়ে গেল ।

ঝুম কিছুক্ষণ নিজের পুতুল নিয়ে খুব খুশী মনে খেলা করল, তার পরে মা আর মেয়েতে একটু কার্টুন দেখা হোল টিভিতে ,এরপরে সে অস্থির, বাইরে যাবে. জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে মেঘ ছাড়া নীল আকাশ, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে লোকজন, ঝকমকে রোদে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে ।

রিমি ওকে নিয়ে এলিভেটরে করে নামল ওদের ছ তলার স্যুইট থেকে । সঙ্গে নিল মেয়ের হাল্কা স্ট্রোলার । নিচে নেমে মনে হল বাইরেটা সত্যিই কি সুন্দর, কত লোক তো ঘোরাফেরা করছে , কি এমন বিপদ হতে পারে ঝুমকে একটু বাইরে কাছাকাছি ঘোরালে ?

কিছুক্ষণ হোটেলের সামনের ফুটপাথেই একটু হাঁটাহাঁটি করা গেল, এটা ওটা দোকান পাট দেখে । এদিকে বেলাও পড়ে আসছে , কিন্তু ঝুম তো আরও খেলতে চায়, ছোটাছুটি করতে চায় , সে খালি আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে খানিক দুরে একটা পার্কের মত ঘেরা জায়গার দিকে । কাছে গিয়ে দেখা গেল যে একটা পুরনো ভাঙা মতন স্কুল-বাড়ীর সঙ্গে লাগোয়া এক বিরাট মাঠ আর কয়েকটি ছেলে সেখানে বাস্কেটবল খেলছে । তাই দেখেই ঝুমের এত আনন্দ ।

খানিকক্ষণ খেলা দেখা আর মাঠের ধারে ছোটাছুটি হোল ,এবারে ফিরতেই হবে ,বেলা প্রায় শেষ । কিন্তু কে যেন রিমির নাম ধরে দুর থেকে ডাকছিল ,এখানে কে তাকে চিনবে ? ভাবতে ভাবতেই একটি লম্বা কোঁকড়া চুলের বছর পনেরোর কিশোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল ।

-তুমি তো মিজ্ রিমি, তাই না...

-কিন্তু তুমি কে?

-আমি লিও, ভুলে গেলে, তুমি তো আমার টিচার ছিলে ।

রিমি তো অবাক , এই সেই লিও ! সেই ছোট্ট ছেলে এই কবছরে এত বড় হয়ে গেছে ,কোন ক্লাসে পড়ছে সে এখন ? সে কি তার নিজের বাড়িতে ফিরে গেছে না সেই বোর্ডিং স্কুলেই রয়েছে এখনও? রিমির অনেক প্রশ্ন।

লিও যেন একটু বেশী চুপচাপ ,কেমন যেন গম্ভীর ভাবে বলল যে এই এলাকাটা ভাল নয় ,সন্ধ্যেও হয়ে আসছে , রিমির সঙ্গে ছোট বাচ্চা ,রিমি যেন তাড়াতাড়ি ফিরে যায়, সে রিমিকে এগিয়ে দিয়ে আসবে ।

রিমির এত কথা জানার ছিল , অনেক গল্প করার ইচ্ছে হয়েছিল লিওর সাথে । কিছুই হোলনা , কিন্তু তার মনটা ভরে গেল আনন্দে এই ভেবে যে লিও তবে বিপথে যায়নি, উপরন্তু শিখেছে মানুষকে সাহায্য করতে ।

ওরা সুরু করল চলতে ।

কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না , এখন বেশ অন্ধকার, এতদূর তো যায়নি রিমি ।

হঠাৎ থেমেছে লিও ,গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বলছে:

-মিজ্ এত আস্তে হাঁটলে তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে, এসব এরিয়া কুখ্যাত গ্যাং এর আওতায় পড়ে, মেয়ের *ঠেলাগাড়ি ফেলে দিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে ছুট লাগাও, তিন ব্লক সোজা ছুটলে পেয়ে যাবে তোমার হোটেলের পিছনের গেট ।তবে যাবার আগে আমার হাতে দিয়ে যাও তোমার গলার সোনার চেইন, এটুকু দাম তো তোমাকে দিয়ে যেতেই হবে একজন গ্যাংস্টারের হাত থেকে ছাড়া পেতে হলে ।*

রিমি থতমত, এই কি সেই লিও...সে ঠিক শুনছেতো...

রিমি যখন ঝুমকে আঁকড়ে ধরে হোটেলের পিছনের গেটে এসে পৌঁছেছিল তখন তার সমস্ত শরীর ভীষণভাবে কাঁপছিল ,ঝুম এতক্ষণ চুপ ছিল ,হোটেলের লবিতে এসে চেঁচিয়ে কান্না ধরল । অমিত এসে গেছে তার কনফারেন্স শেষ করে । তবে সত্যিই এমন কিছু রাত হয়নি ।

একটু পরে রিমির বাইরের কাঁপুনি কমে গেলেও ভিতরের কাঁপুনি অনেকক্ষণ থামেনি, সারারাত সে কেঁপেছে, আশাভঙ্গ আর স্বপ্নভঙ্গের কষ্টে । নিজের ও বিশেষ করে ঝুমের বিপদের সম্ভাবনার জন্য আশঙ্কা ও ভয়, আর মায়ের দেওয়া সোনার হার হারানোর দুঃখের চেয়েও তাকে অনেক বেশী নাড়া দিয়েছে লিও র পরিণতি ।

সেদিন রুম সার্ভিস আনিয়ে খাওয়া হোল । বাইরে বেরোবার মত মুড আর কারুরই ছিলনা ।

বেশ কিছু রাতে হোটেলের রিসেপশন থেকে এলো এক ফোন। রিসেপশন খুব বিনীত ভাবে জানায় যে এত রাতে বিরক্ত করবার জন্য তারা খুবই দুঃখিত , তবে এইমাত্র একজন এসে ম্যাডামের নামে একটি চিঠি দিয়ে গেছে আর বলে গেছে যে চিঠিটা যেন আজ রাতেই ম্যাডাম কে পৌঁছে দেওয়া হয় ।

খামের মধ্যে ছিল বানান আর গ্রামারের ভুলে ভর্তি একটি চিঠি, যার মানেটা ছিল এইরকম ।

মিজ্ রিমি,

পারলে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও আমার আজকের ব্যবহারের জন্য । বিশ্বাস কর আমার কাছে অন্য উপায় ছিলনা । আমি খুব ছোটবেলায় স্কুল ছেড়েছি , আমার মা ছিল আমার চেয়ে ষোল বছরের মাত্র বড়, সে হয়ে গিয়েছিল ড্রাগ অ্যাডিক্ট ,বাবাকে দেখিনি কখনও ,মানুষ করছিল আমার গরীব দিদিমা ,আমাকে ভাল বাসত খুব, আমিও দিদিমা ছাড়া কিছু জানতাম না । কিন্তু আমাদের গরীব পাড়াগুলোর অনেক সমস্যা । স্কুলগুলোতে ভাল টিচার নেই, ঠিকমতো পড়াশুনো হয়না, বড় বড় ছেলেগুলো স্কুলে যায়না, আর আমার মত ছোট ছেলেদের দিয়ে জোর করে চুরি বা ছোটখাটো ছিনতাই করাতো , পুলিশ থেকে চালান হই সোশাল ওয়ার্কারের হাতে, ভর্তি হই রিফর্ম স্কুলে , সে পর্যন্ত তোমার জানা ।

রিফর্ম স্কুলের মেয়াদ শেষ হলে আমার সোশাল-ওয়ার্কার আর আমাকে দিদিমার বাড়ীতে আসতে দেয়নি ,আমাকে পাঠিয়েছিল একটি ফস্টার হোমে, একটি সুস্থ পরিবেশ দেবার জন্য । ফস্টার হোমের মা বাবারা কিন্তু আমাকে ভালভাবে দেখাশুনো করত না , আমার পছন্দের খাবার কখনও কিনতোনা ,এদিকে টাকা পায় স্টেটের কাছ থেকে আমাকে আদর যত্ন করবার খরচের জন্য। তাই আমি পালিয়ে যাই, চলে আসি দিদিমার কাছে ।

ফিরে এসে পড়লাম আরও বিপদে, স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়, পড়ি গিয়ে পাড়ার সেই পুরনো ছেলেগুলোর হাতে যারা এতদিনে ফিলাডেলফিয়ার একটি কুখ্যাত গ্যাং এ ঢুকে গেছে, আমার কোন উপায় ছিল না ওদের দলে যোগ না দিয়ে। সেই থেকে আমি ওদের গ্যাং-মেম্বার হতে বাধ্য হয়েছি । জান নিশ্চয় ফিলাডেলফিয়ার গ্যাং রা কি ভয়ঙ্কর! ওদের নির্দেশ না শোনবার কোনও উপায় আমার নেই, কারন তাতে আমার প্রাণের ঝুঁকি আছে ।

আজ তোমার ওপর আমাদের গ্যাং এর ছেলেদের চোখ পড়ে গিয়েছিল , তুমি যে আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছিলে ,তোমার গলায় আবার সোনার হার । আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই ইচ্ছে করেই তোমাকে ঘুরপথে নিয়ে যাই ,কিন্তু ওরা আসছিল আমাদের পিছু পিছু তাই আমাকে তোমার হার ছিনতাইয়ের নাটকটা করতেই হয়েছিল ।

তোমার হারটা ওরা নিয়ে নিয়েছে, কিছুতেই ফেরত দিলনা ,বলল বেশিবার চাইলে আমার ক্ষতি করে দেবে ।

সরি, মিজ্ রিমি ।

তোমার ছাত্র লিও ।

চিঠি হাতে নিয়ে বিহ্বল রিমি । লিওর জন্য তার প্রাণ উদ্বেল । সে বুঝে উঠতে পারছিলনা যে লিওর এই পরিণতির জন্য কে দায়ী । রিমি ভাবছিল যে সে কি কোনভাবে এখনও পারে লিও কে সাহায্য করতে ?

অমিত রেগে বলল-*এই লোকালিটিতে হোটেল বুক করাটাই ভুল হয়েছে , -কনফারেন্সের লোকেরা হয়ত এখানে ডিসকাউন্ট পেয়েছিল । আর এই তোমার লিও, তোমাকে ঘুরপথে নিয়ে গেছে নিজে চুরি করবে বলে, তারপরে গ্যাং এর গল্প ফেঁদেছে, সব বাজে কথা, এসব ছেলেদের সংশোধন করা যায়না, যে চোর সে চোর ই থাকে ।পুলিশে খবর দেওয়া দরকার ।*

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে রাত কাটল রিমির ।

পরদিন সকালে ফেরার পালা । ওরা জিনিষপত্র নিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে রিসেপশন কাউন্টারে এলো চেক আউট করতে । চারিদিক ঘিরে আছে ভোরবেলাকার নরম রোদ , আগেরদিন রাত্রের আতঙ্কের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও ।

হোটেলের সামনের দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখার মুহূর্তে লস্ট অ্যান্ড ফাউণ্ড কাউন্টার থেকে একটি মেয়ে ছুটে এসেছিল ছেঁড়া টিসু পেপারে মোড়া কিছু একটা জিনিষ নিয়ে, রিমির হাতে দিয়ে বলেছিল ;

– ম্যাডাম এটা কি তোমার? এখুনি একটি ছেলে ব্যাক ডোর দিয়ে এসে এটা দিয়ে বলে গেল যে সে এটা হোটেলের পিছনে কুড়িয়ে পেয়েছে আর তোমাকে দেখিয়ে বলে গেল যে এটা তোমার হতে পারে , হয়ত অসাবধানে গলা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল ।

টিসু পেপারের মোড়কের ভিতরে ছিল রিমির গলার চুরি যাওয়া সোনার হার ।

বাইরে এসে রিমির সেদিন মনে হয়েছিল চারিপাশের হলুদ রোদ যেন হঠাৎ সোনালী রঙের হয়ে উঠলো ।

হয়ত জীবনে কোন জিনিষই সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়না । আমরা অনেক সময় হারানো জিনিষ খোঁজার পথটাই জানিনা ।

References:
https://en.wikipedia.org/wiki/ Ghetto riots (1964–1969)
https://www.history.com/news/The 1967 Riots: When Outrage Over Racial Injustice Boiled Over
https://www.britannica.com/event/Watts-Riots-of-1965
https://metrophiladelphia.com/philly-gangs-once-at-war-now-working-together/
https://blog.phillyhistory.org/index.php/2016/02/the-gangs-of-philadelphia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Nationality_Act_of_1965

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি নিউ ইয়র্ক স্টেটের ভেস্টাল নামের একটি ছোট শহরের অনেক বছরের বাসিন্দা । কর্মজীবনের বেশ কিছু বছর পড়িয়েছেন Emotionally Disturbed টিন এজারদের । এর মধ্যে অনেকেই ছিল Juvenile Delinquents.
এখন কাজ থেকে অবসর নিয়ে সামান্য লেখা ও ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন ।

Debi Durga

Anya Chatterji

Age -11

Grade-6

Amritakshi Sanyal

Age-12

Grade- 7

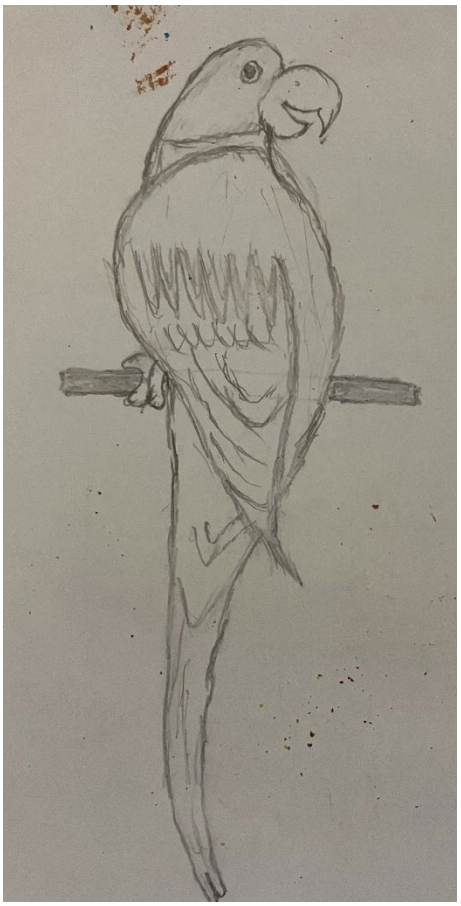

Hakuna Matata: a poem

Amritakshi Sanyal

Baboons swing from tree to tree,
Gazelles graze and wildebeests roam;
Cheetahs dart to catch their prey:
This is the land these animals call home.

Watching from the tall grass,
A lion surreptitiously peeks.
It patiently waits and waits:
To ambush prey that it seeks!

A big cat lets out a mighty roar!
Through the tall grasses it strides:
Watching the leopard arrive,
Impalas and gazelles quickly hide!

In the scorching sun of the savannah:
Bathing in the waters is what they need.
Then they travel in their herd,
With a male elephant in the lead.

Hippos are alert to their surroundings:
Keeping their bodies submerged in lakes.
They can easily take part in fights;
Their tempestuous temperament is all it takes!

Buffalos wander in the savannah,
Watching for predators, they take a glance.
Meanwhile, hyenas try to steal a hunt;
The furtive cats wait for their chance!

A blur of black and white stripes pass:
The savannah is where zebras belong.
Giraffes nibble on nearby acacia trees:
Allowing themselves to be tall and long!

Deer and antelopes quietly graze:
There are several waterbucks and elands;
Wildebeests and hartebeests are spread around:
Peacefully, yet with pride they stand!

Colorful birds fill the savannah;
Flamingos of two types: greater and lesser,
Lilac-breasted rollers, cranes and pelicans;
And ostriches standing straighter and straighter!

Kenya and Tanzania have beautiful sights:
Mount Kilimanjaro stands tall with pride!
Sunlight skips off Lake Nakuru,
And Ngorongoro's crater stretches wide.

Flamingos create a blanket of pink,
As Lake Nakuru shines in the day.
Rhinos roam with their protruding horns:
This wilderness is where they stay!

In Masai Mara and the Serengeti:
Animals in the savannah are completely free.
From mongoose, wild boars, and crocodiles,
To leopards perched on top of a tree!

The caldera lake in Ngorongoro Crater,
Is where flamingos busily shuffle their feet;
It also houses hippos as still as rocks:
While zebras and elephants cross the street!

In Amboseli: full of marshes and swamps,
On a beautiful day, when the sky is clear:
Majestic elephants raise their trunks,
In the background, Kilimanjaro appears!

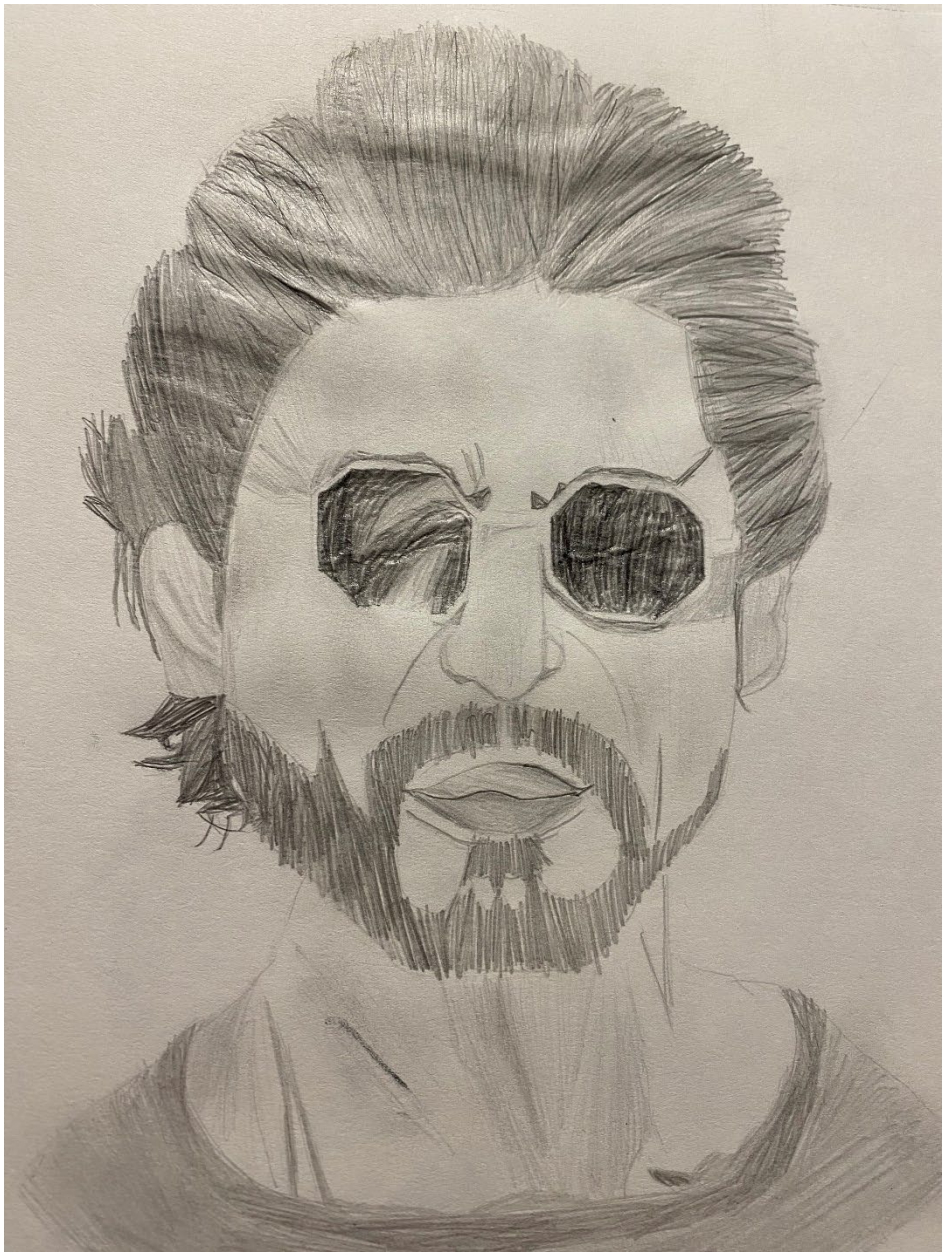

Kriti Bhoomireddi

Age-12

Grade- 7

My name is Kriti Bhoomireddi, and I am in 7th grade. I love Shah Rukh Khan's movies, especially Dilwale and Happy New Year. Combining one of my favorite actors and one of my favorite hobbies was really fun.

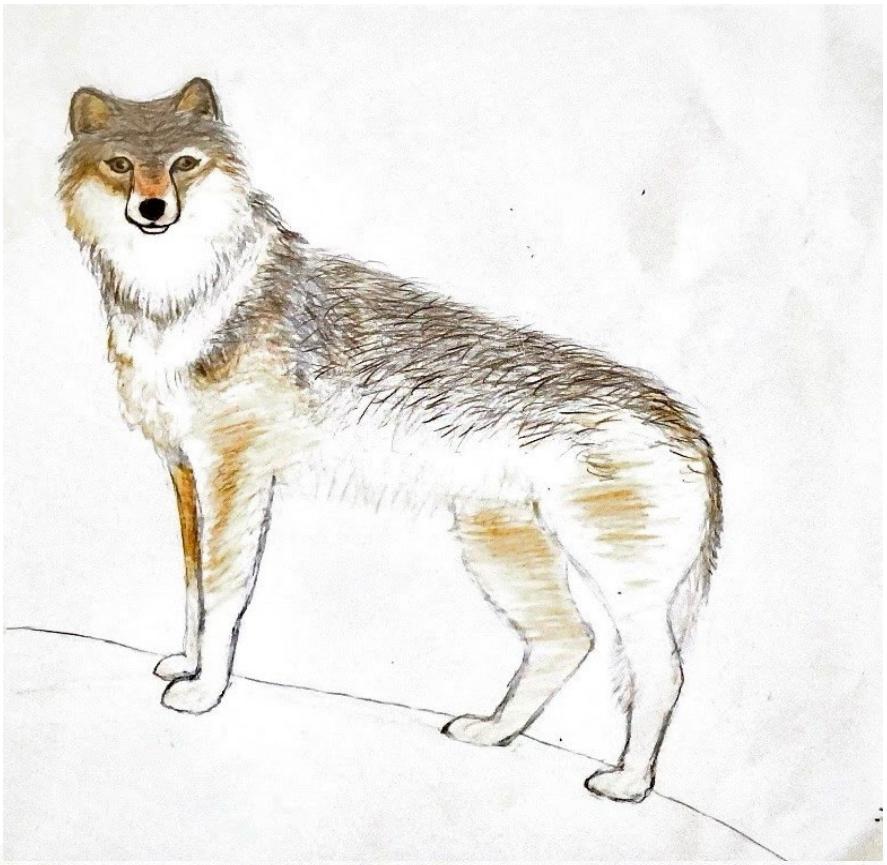

Ella Bagchi

Age- 14

Grade-9

The Wolf

Sureeta Das

Age-14

Grade-10

"Fun time with Grandpa" (Drawn in memory of her grandfather)

Sureeta Das

loves singing, dancing, swimming, and drawing.

Dancing Dandelion

Medha Bhoomireddi

Age:15

Grade: 10

My name is Medha Bhoomireddi, a student who loves art. The colors of India are what inspired me to make this painting of my little sister. This holds a very special place in my heart to have such vibrant colors brought to life.

War: an inevitability

Sayieed Lumran

In this world, war is inevitable.

The oceans witness wars everyday- whales devour fishes big and small.
Sharks swallow shark tails.

The wilderness homes its own wars. Eagles to rats are all predators to prey, while the tigers and lions hatch their schemes on deer.

War runs thru the veins of all civilisations be it civil or otherwise.

And these omnivore humans will stop at nothing. Be it flesh or grass. Sometimes, beyond hunger, they slay their own kind too.

Sayieed Lumran was born on May 8th, 1993, in Bangladesh. Bachelors and master's in law. Poems are regularly published in newspapers and magazine. No published books yet. Currently living in Dhaka, Bangladesh.

Desert Moon

Rwitwika Bhattacharya

Endless boundless barren lands
Rolling hills of golden sands.
The icy wind laments and sighs
A haunting silence softly cries.
The glistening thorns adorn the way
The lifeless night can lead astray.
But gentleness enshrouds the dunes
When softly shines the desert moon.

The pale and lonely naked bones
Turn to gleaming treasure stones.
The darkness of the desert skies
Will draw in like beloved's eyes.
The moon will spread her mystic veil
And spin the perfect fairy tale.
Endlessly she makes you swoon
Treacherous is the desert moon.

I know the spell the moon can cast.
And though the magic fails to last,
I wait for her to cast the spell
Stay trapped inside this barren hell.
A yearning always aches my heart
Like purest lovers torn apart,
And till she spreads her silver plume
I long to see my desert moon.

Rwitwika Bhattacharya is a 34-year-old Psychological Counsellor (Post Graduate Diploma from Jadavpur University) currently residing at Rajarhat, Kolkata. Her passion has always been writing poems, short stories, novels, and screenplays.

FOR HER

Paramartha Bandyopadhyay

When you will be back home tonight,

You will be tired, you have worked hard,

And haven't think of her.

That's the story, Going for a while.

She has even worked harder,

But expecting every night

When opens the door for you,

That you will say something special.

What you have forgotten

And taking her for granted.

Keep aside the flaw,

Buy a rose for her,

And when she would open the door tonight,

Go for the magic.

Hug her tightly,

Kiss her eyes quietly with your eyes,

Touch her lips gently with your rose,

She will reply,

Keep (treasure it) that close at your heart.

The light will have lit, would burn the fatigue in relationship, you have embraced.

You have just met the most beautiful lady in the world.

Love is raining now to bridge the gap.

You're cooling at her lap.

The dream is back,

You're not worrying, not afraid of anything.

Celebrate life,

Laughing and playing.

I'm '**Paramartha Bandyopadhyay'** from Kolkata, India, and service is my profession. My passion is to write poems, stories, and articles.

India's Mission Kabul

Dilip Hari

Collected from various news media.

Once the US Army left and the Taliban took over Afghanistan, we saw that Indian Air Force planes were bringing Indians stranded in Afghanistan from Kabul.

This sounds very easy to see and hear, but we should also know how much hard work and diplomacy the Indian government was behind to accomplish this arduous task.

First, we do not have any direct plane route to go to Afghanistan. For this, the shortest route is through Pakistan, but as always, Pakistan is a big hurdle in this situation. That's why Indian planes must take a longer route and go through Iran.

For this, the Government of India first obtained Iran's approval for airspace use for Indian Air Force aircraft. Getting this approval was not such an easy task, because no country allows another country's Air Force to use its airspace. However, the Indian government was successful in getting this permission from Iran.

Even after obtaining this permission, there was another issue: i.e., Indian planes could not land directly in Kabul Because India's relations with the Taliban have never been good.

Therefore, the Indian government could not rely only on the Taliban to keep the Indian Air Force plane standing at Kabul airport for a long time.

On the other hand, in view of the chaos and huge crowds at Kabul Airport, it was not possible for the Indian planes to remain parked there.

To solve this, the Government of India found another way, by resorting to the airport of Kazakhstan.

Once again, Indian diplomacy was successful, and Indian Air Force planes got permission to use Kazakhstan airport & air space.

Then the Indian government also had to address another problem: how to transport Indians to Kabul airport because after the capture of Kabul by the Taliban,
Taliban fighters have set up their check posts at different places, and they resort to conducting a thorough search of every person coming to Kabul airport.

Furthermore, Indians couldn't gather together at Kabul airport due to the chaos at Kabul airport.

Eventually, the Indian Embassy staff in Kabul also found a solution. They arranged a large garage near the Kabul airport where they could house around 150-200 Indians at one time.

Now, every day, Indians first gather in the garage. This work of gathering Indians goes on day and night 24/7.

For this, the Indian officers themselves take their car and reach the places where the Indians are staying, taking them to the garage adjacent to the Kabul airport, while forever dealing with the Taliban check post personnel, all over the place.

When enough Indians have gathered in the garage, the information is passed on to the Indian Air Force officers stationed in Kazakhstan and the US officials stationed at Kabul Airport.

It is noteworthy that the ATS control and security control of Kabul Airport is in the hands of the US Army.

After this, clearance is given by the US Army to land the Indian Airforce transports, Then the Indian Air Force plane standing at Kazakhstan Airport flies from there and reaches Kabul.

By the time the plane was preparing to land, all the Indians from the garage had reached the airport in the US Army vehicles.

They are immediately boarded in the Indian Air Force plane standing there, and within 15 minutes, this Indian Air Force plane flies out of Kabul towards its country with the Indians.

Let us thank our Air Force and all officers & personnel of the Indian Embassy & its allied personnel who are engaged in this daunting task, and salute them with our grateful thanks for their yeoman service!

Whatever our internal political differences may be, It is heartening to support all efforts & decisions by the Govt of India not to leave any Indian behind in Afghanistan at the mercy of uncertain Taliban violence—salute to the Indian Airforce.

Dilip Hari is a CPA and Chartered Accountant who attended Cornell School of Hotel Management. He owns a Hotel Management Company DPNY Hospitality, and manages Hilton, Sheraton and Best Western hotels in four different states. The website is www.dpnyhospitality.com.

Dilip also owns a chain of French Wine Bistro with 7 locations in Manhattan, NY and one in Washington D.C. The website is www.vinsurvingt.com.

The Menace

Aniruddha Sen

Sumit is working in Mumbai. But whenever he manages to take a few weeks off, he rushes back to Kolkata, the city where he was born and brought up and where his roots still are. This time when he came to Kolkata, it was the onset of winter, and fresh seasonal fruits and vegetables started appearing at the markets. But it was not yet time for freshly made jaggeries or *Notun Gur*.

After visiting his friends and relatives at downtown Kolkata and with his body and mind fresh with the aroma of the great heritage city, Sumit decided to chance upon the nearby suburbs. Dilip was his close friend, but they hadn't met for quite some time. They, however, were in email contact. Dilip often requested Sumit to drop in at his Belgharia residence when Sumit comes to Kolkata next. Usually, Sumit is tight with his schedule but this time he had a few spare days. He decided to surprise Dilip with a sudden visit to his residence.

That left a small chance that his good friend would not be at home. But Sumit could bank on the innate laziness of the fellow who was cozily satisfied with his stable ten-to-five job and would rush back home the moment office hours were over. He would be either indoors, on his desktop or at best at the adjacent clubhouse for adda, i.e., idle chatting.

From Sealdah, Sumit boarded a barrackpore-bound local that was not too crowded. After disembarking at Belgharia, he proceeded towards his friend's house through lanes and by lanes. But after a while, he felt everything around him was not normal. As it was winter, the Sun had set early. But even before six PM, there was an eerie silence of midnight at the locality. The municipality had not bothered to switch on streetlights, probably with their clock still tuned to summertime. At both sides of the roads, the doors and windows were firmly shut, and hardly any rays of light were escaping through them. There were few people, if any, on the roads. And even those few, when asked for directions, just answered in brief and rushed away.

What was it? Was there some danger lurking around on the streets? Sumit then recalled the words of caution from his cousin Somnath, "Kolkata is a really animated city. But nobody can predict when some trouble will erupt due to rivalries between parties or gangs. Was it something like that – a clash, then disturbance, and finally a curfew? Unknowingly, had he landed into that mess? He wished he had informed Dilip before coming.

But by then, he had advanced too far. Even if there was some danger on the road, it would be safer to somehow reach his friend's house and take shelter, rather than trying to walk back to the railway station.

Well, finally he managed to reach Dilip's house without any hassle. Yes, it was his house, for sure. The nameplate clearly indicated that. But all the windows were firmly shut, and there was no clue as to what the inmates were doing. Shaking off the initial hesitation, he rang the doorbell.

Through the eyehole, a suspicious eye was trying to guess who the person at the door could be. Then a pair of hesitant hands opened the doors and started unfastening the door chain. Once the door opened, Sumit was relieved to find it was none other than his pal Dilip standing in front.

With a beaming face, Sumit was going to crack some silly joke. But before that, Dilip whispered, "Come inside immediately", yanked Sumit in, and then closed the door in a jiffy.

"My God!" Sumit exclaimed, "What's the thing you all are so dead scared of – so that in this early evening, the entire locality has shut itself in behind closed doors and windows? Is it a wild beast or a murderer on the prowl?"

"No murderer but killer for sure." Sighed Dilip, "It's the blessed mosquitoes. Aedes, anopheles, culex, and name anything you would like – this early evening is their shift change time when all these bloodthirsty monsters are out to suck their victims. Permit them an inch, and you invite Dengue, Malaria, Filaria, and whatnot! We all tightly shut our doors and windows a few hours in the early evening to prevent that menace."

Aniruddha Sen is an electrical engineer from J.U. and a retired scientific officer of TIFR, Mumbai. His stories, articles and poems in Bengali and English have been published in several printed and web magazines, occasionally in some mainstream ones. He had authored three story collections in Bengali and one in English. His interests include science and conservation.

Hello Popcorn

Sheema Roychowdhury

Hello! I would love to meet all of you and make friends! I am Popcorn. No – not the microwave snack. I am a Schnoodle, a popular hybrid which is a cross between a Poodle and a Schnauzer. My coat is curly, and the color ranges from white to blackish gray. I do not shed. I am a small-size puppy and just turned one year old! I am playful, intelligent, fun-loving, and very loyal to my parents. I do like to bark whenever I see new people. I protect my mom from any strange environment, and my barking alerts the whole family. My parents are trying to train me to use my barking for good reasons, but sometimes I just can't help myself.

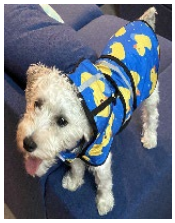

I run around with my dad frequently in the yard. I love to play fetch. My parents keep all my toys in a basket just for me. In the morning, I take them out and play. My favorite ones are the squeaky and chewy toys.

I'm pretty lucky to have found a loving home with my parents. You see, I am adopted. I was born to a breeder in Mississippi. Unfortunately, they could not sell me. They left me in the forest near a highway to fend for myself. I lived on grass and leaves. One day, a shelter agency found me, fed me and got me a health check-up and all my vaccines. Then they sent me up to the rescue mission, To Love A Canine, Inc., in Pennsylvania, where I was put up for adoption.

My mom had been wanting a dog for a really long time. She searched high and low, falling in love with almost every doggy she saw. When she showed my picture to my dad, something about me must have caught his eye, and they placed an application. After a few weeks, they got the call that they had been selected to be my forever home. They were so excited! They bought all kinds of toys and blankets and treats and watched tons of YouTube videos to be as ready for me as possible.

The night they picked me up was really cold and rainy. I have to admit, I was a bit scared and didn't really know what was happening. We drove home with me on my mom's lap, and she cuddled me in a really soft blanket. I was nervous and tiptoed to a corner of the house. My parents built a pen and kept me there to train initially. I looked through the big glass door in the morning – so many birds and deer, at times roaming in the yard. Yes, I barked at them too. Over the next few days, I cautiously started to explore my new bed and toys. It took a few weeks, but slowly I built more confidence, and now I know every nook and cranny of our home. They send me to a doggy daycare every so often so I can get some exercise and play with my friends. I enjoy my time there, but I also get really excited when my parents come and pick me up.

In the beginning, I used to spend the night in a crate downstairs. But I got lonely and would bark the whole night. My parents understood and took me upstairs to their bedroom. I behave now and stay quiet till they get up. But sometimes, I cannot help my curiosity. During the day, I sneak through the door and jump into their bed. Wow! These are pillows – so soft and cushiony. I do have very soft blankets. I like to chew the corner of the blanket even though I know I'm not supposed to. I should only chew my chewy toys. When my parents go to work, I like to take a nap on the couch by my mom's blanket.

I usually eat breakfast and dinner, but not too much. I'll eat my kibble, but when there is cooking in the kitchen, I get intrigued by all the aromas. When my Dida comes, she makes some chicken or salmon, especially for me. I love it, and the small pieces of roti she sneaks me.

I'm learning a lot, and I can read human body language very well. I have a unique way of bonding with them. I am a good companion, and I know I'm lucky to have found my forever home where I love my family, and they love me. If you love pets, there are many rescue dogs in shelters who are in dire need for fostering or adoption. I earnestly hope you will consider adopting; trust me, it's love and happiness like none other in the world.

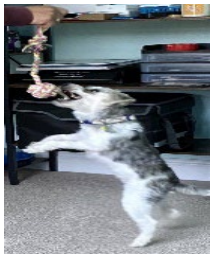

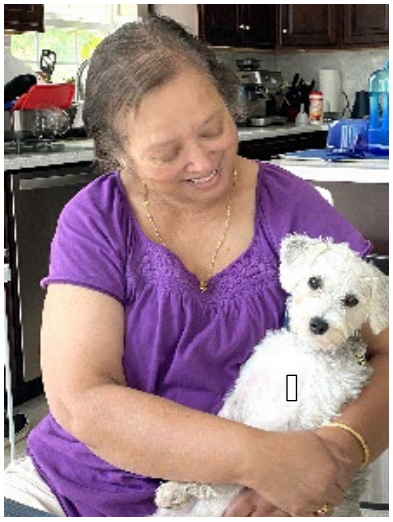

Sheema Roychowdhury

Educated in India and the USA. Retired Principal Scientist from a Specialty Chemical Industry. Enjoys flowers, gardening, and playing with Popcorn.

Working with Different Populations of People and Different Careers

Archana Susarla

Working in a community with different populations of people can be very rewarding and can build many different skills. I have been working since 1992 in different organizations in different capacities.

Lourdes Hospital

From 1992-2008, I worked in Lourdes Hospital in different departments, Admitting, Dietary, Pathology, Oncology, and Total Quality Management. In Admitting, I signed patients in the hospital and guided them to the appropriate departments in addition to learning the skill of pushing a wheelchair. In the dietary department, I was responsible for providing breakfast and lunch to inpatients and learning about diabetic diets and those patients with food allergies. In the Pathology department, I assisted the pathologists with chart filing of various diseases. In the Oncology department, I assisted the oncologists with chart filing for patients diagnosed with either one or multiple types of cancer, learning the many different types of cancers a patient can have. In the Total Quality Management Department, I filed patient surveys as to their opinion of the hospital, staff, and environment.

BOCES Pre-GED program

For the Spring semester of 2000, I tutored in a Pre-GED (Generalized Education Diploma). I tutored an individual in basic reading and math. I began teaching her the alphabet and basic numbers. Eventually, she could recognize both upper and lower-case letters and write the numbers from one to ten.

Wyoming Conference

During the Spring of 2002, I completed an internship at the Children's Home of the Wyoming Conference with elementary and high school students who were physically, sexually, and emotionally abused as well as those children who abused drugs. Some of these children had run away from home. I had these students complete questionnaires and assessments on fire setting, evaluating their anger management skills. I also engaged them in physical activities such as soccer, basketball, and volleyball. I was also required to write a report on what I was able to observe.

Special Olympics

From July to August of 2011, I worked for the Special Olympics at a local church, engaging elementary school children in volleyball, basketball, bocce, and soccer. These were elementary school-aged children diagnosed with cerebral palsy, spina bifida, and other disabilities.

Literacy Volunteers of Broome and Tioga Counties

For 2014-2020, I tutored basic math and reading. For the Literacy Volunteers of Broome County (LVBTC). I taught a young lady how to add, subtract, multiply, and divide basic numbers, fractions, and decimals. Also, I showed her how to convert fractions to decimals and vice versa, by using money and other visual

cues. I also did group tutoring in the Broome County Public Library for basic math and reading. While tutoring, we did children's fairs in the library where we provided free bookmarks, books, and stickers for the children. The Literacy Volunteers also raised money for the dinners we had. We also had an annual Family Fun and Awareness Day, encouraging families to read together and providing them with free books. As a tutor, I also received training in Adult Behavior Education (ABE) courses as to how to assist students in auditory, visual, and kinesthetic learning.

Susquehanna Nursing and Rehabilitation

From December 2014 to April 2015, I worked at the Susquehanna Nursing and Rehabilitation with patients diagnosed with Advanced Alzheimer's Disease. I engaged these patients in recreational therapy such as reading to them or watching television with them. I also spent some individual time with a patient learning how to feed her.

Alzheimer's Association

Beginning in 2014, I have been doing the annual Walk of Three Miles to end Alzheimer's Disease at either Otsiningo Park or Binghamton University. I have raised money that provides medicines, and medical care, and supports our local day programs, nursing homes, and hospitals for patients being treated at any stage of AD. In 2022, our mother was also able to complete the walk with me.

Yesteryears Day Program

From 2014- 2018, I worked at the Yesteryears Day program both in Binghamton and Endwell. The clients in Binghamton were more social, and the clients in Endwell were more passive. I engaged them in activities such as bingo, marbles, and dominoes. This helps maintain their memories of shapes, colors, numbers, and sizes. We also took them on picnics.

North Shore Towers

From 2018-2020, I worked in the North Shore Towers assisting patients with dietary plans and engaging them in social interaction. We had clients maintain their fine and gross motor skills by having them chop vegetables to help them cook. We also engaged them in games such as marbles, dominoes, and bingo. This also maintained their long and short-term memories and their fine and gross motor skills, as well as their conversational and turn-taking skills. Engaging patients in social skills also maintains their skills to multi-task.

Working in different places provides complex social interactions, communication with professionals at different levels and exposure to people of various abilities, different cultures, and age groups as well as social economic status.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology.

The Enigmatic Lady

Sajal Kumar Maiti

It is mid-summer night. A long serpentine queue moves slowly through the aerobridge for boarding at Thai Airways' Flight No. 899 scheduled to fly at 12 midnight from Netaji Subhas Bose Airport, Dum Dum, Kolkata to Changi Airport, Singapore. In the queue last but one casually stands a beautiful young lady. The lady wears stretch jeans, a bright purple top, and a travel hat. She handles loosely with her right hand a light travel trolley and a cute lady's bag hangs from her left shoulder. Through the aerobridge, she moves to her window seat in the middle of the aircraft.

At the entry point, beautiful air hostesses offer violet orchids wrapped in silver foil at the bottom of the orchid to each passenger. The lady keeps her trolley suitcase in the luggage cabin at the top and takes her seat; lifts the window shutter; as she lifts the shutter, a glimpse of sunrays suddenly flush on her oval-shaped innocent face. Rays start playing with her bright lotus eyes. Greedy rays are sucking her cheeks, chin, and rose-like tender lips as if sucking honey out of these flower petals.

The plane takes off. With slight jerks, it starts to fly high to higher in the blue sky. The lady looks through the window. The blue sky comes closer as if it can be touched with hands. Her un-knot long wild hair creates a cloudy environment. She now tries to manage some of her unmanageable naughty hairs with her left hand's golden Champa flower-like fingers. As the plane flies higher in the sky, clouds like combed cotton become visible and closer. It creates a situation as if a mythical chariot moves this dreamy path to reach heaven. The lady makes her journey in an imaginary path. She now takes a selfie as her usual habit.

The journey is completed in two hours to reach Bangkok's Sukarna airport where she must change her flight to Changi airport. While walking on the moving path of the flyover to board the scheduled flight for Changi, on the way the official of the Airways helped her to reach the flight. When she boarded the flight, she was a bit astonished to see that the flight was full and almost ready to fly. It was waiting only for the lady as the last passenger. Now the flight takes off without any jerks. Here the lady had an aisle seat. She takes her seat, pulls out an English novel book from the side bag, and is deeply engrossed in reading. The novel was Arundhati Ray's " The God of Small Things."

After two hours the flight landed at Changi Airport. Along with others, the lady follows the immigration counter for clearance. She puts her passport and tourist visa on the counter for necessary clearance. The lady at the counter, after having checked all the papers politely asks, " Are you alone?" A philosophical reply comes, " You come alone, you go alone, everyone is alone in this world." The lady at the counter smiles and puts the necessary stamp on the documents and hands them over to the lady.

Outside the airport, there was waiting a prescheduled private car, and its chauffeur was holding a placard with his hands meant for the lady. A lady with her luggage straightway boards into the car. The car moves on the smooth, broad, beautiful road. Both sides of the road are full of natural picturesque. The entire journey was a symbol of silence, no horn, no crowd, no commotion. The car reaches Genting Island; a complete Resort City where you cannot differentiate between day and night; every modern amenity can be availed of.

The lady with her travel trolley waves to the reception where a series of young boys and girls are meeting the demands of the customers. The lady approaches such a counter. The girl at that counter after having checked the papers issues a card to her for a hotel room. A hotel boy is associated with the lady's trolley towards the room situated on the 28th floor of the Twin Tower hotel.

As they reach the hotel's ground floor where eight lifts are running ups and downs relentlessly. They boarded one of them and within moments reached the 28th floor. While moving to the allotted room through the corridor, a sweet musical symphony welcomes through the walking journey. Both sides of the corridor are arranged with a series of rooms. They reached the lady's room. The boy places the card before the lock of the room and the room opens. The boy takes leave of her and departs. The lady enters the room, as she puts the card in the box, the lights automatically turn on. It's a suite with a large bedroom; a queen bed, a fridge, a locker; and a coffee maker with several coffee and sugar pouches. It has a drawing room with couches, a tea table, etc. It has got a portico too. The suite has a large bathroom with a bathtub and concealed toilet facilities. It is provided with modern toiletries.

The lady, after making herself fresh took a cup of hot coffee and went to portico. After completing her black coffee, she places the cup on the tea table and starts to stare at the clear blue sky. For some time, she was absent-minded as if she was speechless at the natural beauty of the sky. Now it is bright noon. The lady comes out of her suite, and goes to the backyard where the pool with its cool crystal-clear blue water pulls the lady to enjoy its beauty. The lady enters the cloakroom, keeps her garments there, takes a large pink bath towel, covers her body, and then comes to the brink of the pool. She throws the towel on the sunbed and jumps into the pool with her two-piece.

As she jumps into the water, it creates rings of water waves in the water of the entire pool. She was alone in the pool, swimming like a big fish making wild waves into the blue tranquil water of the pool. Sometimes she sinks herself, sometimes she keeps herself floating. She is having fun with the water of the pool. Or someone may think water droplets are playing with the lady, her body, her naked legs, hands, body parts, hair, nose ears, and eyes. The Droplets are also having fun with the lady; they are playing with her. Each body part, even intimates are not spared. It has become a wild play across the entire pool. Witnesses of this play are the open sky, the cool breeze, the noon sun, and the trees around. How long did this play continue no one knows…

The lady, all of a sudden, opened her eyes from her deep dream sleep as the morning's bright sunlight put a sudden glimpse of rays on her beautiful innocent face; the rhythmic sound of drum beating from a nearby Puja Pandel created a musical tone into her ears; waving scenes of white Kash flowers put a soothing effect on her eyes and She now realizes that so long she was in her bed of her own flat in the French city of Chandernagore.

Prof. (Dr.) Sajal Kumar Maiti is the Professor of Commerce in West Bengal Senior Educational Service (WBSES) in almost two-century-old Hooghly Mohsin College, Chinsurah, Hooghly, West Bengal. He has served more than thirty- six years in different other colleges including Darjeeling Govt College, Goenka College of Commerce & B A, Kolkata.
He has several publications in different reputed national and international journals. He is also the author of several short stories, articles and poems published in different online and offline journals and books. He lives in Salt Lake, Kolkata, with his wife and daughter. He is also engaged in different social activities.

Teamwork

Sushma Vijayakrishna

“And the first place goes to…

Though the result was an expected one, everyone still held their breath to hear it. That's the adrenaline rush caused by a sports meet. Without any premonition, Kathy Blake stood up from her seat and started to walk towards the podium.

The chief guest adjusted his microphone and started to read out the enclosed result, “It seems that this was a very close finish to last year’s record, and now even better, this year we have a new champion, and the first place goes to …. Ms. Lisa Gonzales!”

With a lot of hush, hush around the podium, people turned around, trying to spot Lisa in the crowd.
Kathy felt a rush of heat all over her head and shoulders, as she heard the announcement, and the podium suddenly went blurry in front of her eyes. “How on earth can this happen? I was the first to finish. Lisa wasn’t even in sight at the final mile count. There must have been a mistake”.

She recovered from her temporary blankness and started pacing even faster to the back of the podium, to Mrs. Philips, the team coach.

As soon as she spotted her, she burst out in tears, “Mrs. Philips, there must be a terrible mistake in …”
Mrs. Philips looked at her from the top of her reading glasses and nodded in disagreement.
“Kathy, the time count was kept by a digital software, and it is very accurate to the second decimal point. Lisa finished earlier than you and she is the new track champion. Come on, be a sport! Keep up the good practice honey. And never forget to enjoy your sport.”

Kathy was now really feeling empty in her stomach. She was so sure that she saw no one behind her during the meet. This turned out to be a totally unexpected night for her.

Vinnie, her close friend, was frantically searching for her, and spotted her backstage. She rushed to her and almost cried. “Kath- can you believe that Lisa actually broke your last year’s record by 3 seconds?”
Kathy gulped down the anger and frustration and said, “She finished 3 seconds early? It was then, she realized that she did not even care to check her finishing time in today’s race. She was too confident to out beat herself from last year. She looked up at the scoreboard and was shocked to see she actually was behind her last years’ time by about 5 seconds. Of course, she did not see Lisa or anyone else behind her, as Lisa probably had passed the last mile-count sign.

This made her feel even worse. How could she possibly be so behind her usual time? She had been practicing really hard this entire summer. She did not join the usual family get-togethers, friends’ pool parties, concerts and even the movie nights.

Lisa moved into town that Spring and signed up for track much later in the school year. Her mother Rebecca Gonzales was a new single parent and moved into town with her high schooler daughter, Lisa and her middle schooler boy, Joseph for a job in a local restaurant run by her distant relative. They rented out a small home, a few miles away from the restaurant. The kids used the bus to get to school and Becca drove an old hatchback to work. Lisa definitely stood out in the school due to her limited means and was not readily welcomed into any of the clubs or

group activities. She was an above average student academically, however when the other students witnessed her track performance, some of them walked up to be friends with her.

Kathy, on the other hand, was the daughter of a businessman William Blake, and lived in a huge bungalow. She had everything she needed and never felt the need to ask for anything in her life. Her father even had ties with the local political leaders and could influence people to a certain extent. She was the 'richie rich' of the town. However, she was an outstanding student both academically and at athletics. This naturally made her a very popular girl in school, and she thoroughly enjoyed this celebrity status like any other teenager.
She did not take a great liking to Lisa the first time she saw her; hence also paid no serious attention to her athletic skills. And now more than ever, she was not able to digest the final result of the track meet. Her train of thoughts were impossible to concur.

She assumed that someone like Lisa would never be able to win a race. She had a typically conditioned mind and believed that athletics were for those who could only afford them. According to her, Lisa did not even have the proper sports gear to run a race. How could she possibly win it then?

As she pondered over all these thoughts and reached home, her father was waiting to meet her. He had been on a business trip and couldn't make it to the track meet. She rushed to him with tears in her eyes. She told him everything that had happened and sank into the couch next to him. Her father had always been a great friend to her, and she confided in him. He made sure he always had time for her, despite his busy schedule.

Bill let Kathy cry for a little while, and then slowly started speaking to her.

"Kathy, my child, this is a moment of truth every person should seek and learn from. This may be your first one, but it happened at the best time of your life. You are growing to be a woman soon, and it is now that you should understand the reality of life. All that you have and are enjoying is provided by me. This should not let you think that you are entitled to treat others any differently. You have made many assumptions in Lisa's case and kept yourself away from the truth. As far as I understand, she worked extremely hard to participate in the race, and probably more than you without the necessary resources. It's high time that I would like to share a little story from my childhood.

Your granddad was not born a rich man and actually started out as a minimum-wage skilled worker at a local workshop. He struggled to make a decent living for our family of four. He was very good with heavy machinery and soon earned the respect of his colleagues, especially Tom, who later became his best friend. They spent a lot of time together, even though Tom came from an upper-middle-class family. He never treated Granddad differently. Tom worked out all the vendor contracts, and was the networking face of the business with all clients.

Unfortunately, the owner of the workplace was dying of a certain type of viral sickness. He noticed the teamwork of these two hard-working young men and decided to offer a partnership in his business. Having no family of his own, he wanted them to be his successors. This proved a great opportunity for both Granddad and Tom, and they worked even harder to take the business to the next level.

Over time, this teamwork along with some timely decisions in the right direction gave the business a desired elevation. The most important thing was that life was kind to them.

When handing over the business to me, Granddad said, "Bill, along with the opportunity and kindness from my boss, I had Tom with me. To share a success, to withstand a failure, it is important to have a good friend who shares the same dream and is willing to travel together with you, despite the differences you share with them. I was very lucky. Also, always remember to be kind and sensitive to people who are loyal to you. Express your gratitude in words and action every now and then. Check on your employees and make sure they are happy."

Bill finished talking and smiled at Kathy with a ‘do you know what to do next? ‘Look. Kathy kissed her father goodnight and went into her room, feeling much better than earlier in the day.

The next day, Kathy went to meet Lisa with a bouquet of flowers and a ‘congratulations’ cake. She asked her if they could practice together for future meets. Lisa was happy to see Kathy not upset about the win. They soon became good friends and worked together on their practices. The next year’s annual track meet witnessed two good friends share a success story with pride and contentment.

–

Sushma Vijayakrishna

I am a teacher by profession and an ardent lover of nature by heart.
I strongly believe that our very being is always influenced and
improved by observing two important facts of life: Mother Nature and People!

The Abyss

Gandharbika Bhattacharya

A siren blared like the wail of a mythical monster. Sonia felt her throat go dry.

“C’mon, let’s *hide*!”

“Hide? From *him*?” A smile curled the corners of Rita’s lips. She jerked her head towards the occupant of the bed.

In the peculiar shade of light and dark – the indigo of the sky slashed by the orange of streetlamps – a jarring contrast that gave even ordinary things the illusion of being grotesque, the man still looked to be no match for the sisters. Frail and thin. Elderly.

An easy target. Still...

“He might wake up and call for help,” Sonia spoke through gritted teeth. “We don’t want *that*, do we?”

Rita considered this. A moment later she gave a nod.

It *was* prudent to hide – two monsters lurking in the dark until the siren was out of earshot.

The sisters crouched behind a hamper full of clothes, leotards brushing against each other like angry serpents. Sonia began to count the seconds. One...two...three...The siren moaned past the house, flashes of red and blue at the window. Four...five...six...it grew distant, like an unimportant memory. Seven...eight...nine...it was barely audible.

The man turned in his bed. Sonia’s body tensed, but he didn’t open his eyes. He was saying something in his sleep.

A somniloquist. That was interesting. Putting out a tendril of a finger Sonia touched Rita’s sleeve.

“We are dreaming, aren’t we?”

“Probably.”

There was a very good chance that they were dreaming, that none of it was in any sense real. But beyond that, nothing could be said for sure. The line between dream and wakefulness had blurred some time ago.

Yet it wasn’t where the sisters had begun. If Sonia tried hard, she could remember a time when they used to live a life of abundance. Abundance of *dreams* in case it wasn’t clear from the previous sentence. But their luck turned soon after they crossed seventeen. A few inconvenient deaths, the question of money, of ‘growing up and facing the world’...bit by bit ‘outside’ had pushed in and chipped away at their Dreamland until, one day, they were left with nothing but scraps – tiny bits which, when sewn together, could form only half a quilt between them. Not enough...not enough at all to cover the Abyss sleeping under it.

“Looks like we’re out of dreams,” Sonia said miserably, as she blew out the last candle of hope.

Rita took a long drag on her cigarette, a single point of red in the velvet darkness.

“Looks like it, sister dear.”

It was a worrying thought. Any time now the Abyss would start to move.

Rita stared at a spot in the ceiling with half-closed eyes. A cat mewed from somewhere.

“It needn’t come to that,” she said after a while.

Sonia sat up straighter. “What do you mean?”

Rita chuckled softly.

“I mean if our garden refuses to bear fruit, we’ll have to look further afield.”

“Meaning?”

“...steal from those luckier than us.”

“You’re bonkers!”

Sonia tried to get up, but Rita grabbed her arm.

“Listen to me!” her voice was urgent now, “Do you want the Abyss to wake up? We’ve got nothing to feed it anymore. Stealing is our only recourse.”

“But...” Sonia shook her head. It was not *right*. If people started stealing things at will...

“You got a better idea?”

Sonia’s shoulders sagged at that. The writing on the wall was clear. Unless the sisters wanted the Abyss to awaken, and both were painfully aware of what happened the last time *that* happened, they had to find dreams to feed it. Lots of happy dreams. Something they were in short supply of.

“It is still *wrong*.”

“Only if we get caught,” Rita waved her cigarette. “We’ll steal from the rich – those who still believe in ruby slippers, and Hogwarts, and Middle Earth, and the triumph of good over evil. They have so many dreams they won’t even notice if they lose one or two along the way.”

“What if we get caught?”

Rita stubbed out her cigarette, wiping the ash off her pyjamas.

“We’ll need to be careful. For instance, we can’t cross paths with the Sandman.”

Sonia gasped. “The Sandman! How can we avoid him?”

Rita’s body began to shake. Sonia was alarmed. For a moment she feared her sister was having a seizure. Then she realized that Rita was laughing. Hard. Pools of inky black laughter streamed out of her lips and shook the Earth and covered the stars above.

“Don’t tell me you still believe in the *Sandman*?” Rita wiped the corners of her eyes. “He is usually the first to go. Right around Santa Clause.”

Sonia shuddered. Pieces of dreams floated down around a large, tinsel-covered tree. The first dent in Dreamland.

The damned Rita knew exactly which buttons to push.

“When do we start?”

"Tonight."

And so, the sisters embarked on their life of crime. It took them some time to evolve their seamless chemistry. On the very first night, an argument broke out regarding their choice of victim.

At the end of Dreamland where the clouds meet the sky, is a precious thing called happiness.

It was the last scrap of hope left behind in the threadbare patchwork quilt that was covering the Abyss. Both sisters vied for it, clung to it, and devised elaborate plots to claim ownership of it. As a compromise Rita and Sonia agreed to take turns to select their preys...

That first night Rita was partial to a snoring fourteen-year-old, while Sonia was more circumspect.

"He might wake up...choose someone younger."

"Younger than fourteen? Do you want to rob an *infant*?" Rita laughed incredulously. But the laughter died in her throat. "Oh my God, you're serious!"

"Baby steps," Sonia replied firmly. "Easy does the trick."

When they returned to their beds that night, Sonia was suitably chastised. The baby's dreams were bland, to put it mildly. Things like 'food', and 'wet', and 'Mama' were all that occupied its head. There were attractive shapes too, in many colours. Sonia supposed they were toys.

"Happy now?" Rita hissed in her ear. "Coward!"

"Alright! Tomorrow we'll rob your fourteen-year-old!"

He turned out to be a prolific dreamer. His head was full of amazing technicolour dreams, all glory, and adventures. He had decided he was going to become *someone* in life, meaning someone important. There was a love story he had spun out of thin air – the kind of love that blindsided with its intensity, the sort that swept you off your feet and you flew along, not caring where you'd find yourself once the ride ended. To the sisters it was like a feast for the eyes. Sonia felt adrenaline course through her veins as she marvelled at the ideas revolving around the boy's young head. Dreams – beautiful, glorious dreams to see her through the freezing night...

Those who own their dreams, those who still hold the map to their Dreamland, can keep the fire going even in the middle of a blizzard. But stolen fire burns out quickly. A single dream didn't have a hope of sustaining the siblings through the long winter. They needed more. More and more. Their hunger grew. Again, and again their victims woke up in the morning after a dreamless sleep, haunted by the feeling that something important had slipped out of their minds.

As the nights progressed, as the sisters became masters at their game, they realised their taste in dreams was somewhat different. Sonia harboured a partiality for adolescents, for emotions that were still raw and colourful and brilliant like the feathers of a macaw. Rita, meanwhile, was fascinated by adults who still believed in miracles, and leprechauns, and pots of gold at the end of rainbows.

"Ouch!"

A poke from Rita brought Sonia back to the present.

"The Dream Catchers are gone," Rita whispered to her. "Time to go for the kill."

She was right. The road outside was deathly quiet. The sound of soft snores filtered out of every house.

The sisters emerged from behind the hamper and stood on either side of the bed. Together they raised their right hands. Then, in a fluid motion, they gently put their thumbs on each of the man's eyelids.

The pain was immediate and blinding.

Sonia gasped. She felt ice coursing through her veins. She tried to pull her hand away, but it was stuck, as though drawn by an unseen force. When she looked at Rita's face, she saw her own horror mirrored in it.

The man wasn't walking towards the place where the clouds meet the sky. He was groping through his own personal purgatory. He was caught in a loop – only one event played in his head over and over like a broken record until he was ready to go mad.

It wasn't a dream...it was a nightmare!

The white room of a hospital.

The man's wife was on her deathbed.

He felt cold and oddly apathetic.

He looked at her face. The first time he had seen that face she was standing at her doorstep...no, even before that. He had seen her picture inside his friend's wallet.

"Tell her I love her," his friend gave a last shudder.

Gunshots sounded in the distance.

The man kept his promise. He delivered his friend's message to his wife. Then, overcome by desire for her he said much more, so that they were married by the end of the year.

It wasn't a happy marriage.

A machine was beeping. With the count of her heartbeats, he was counting down the seconds until the inevitable. His wife was not a good woman. She deserved this pain for seducing him, making him betray his friend. She couldn't even bear him the child he desperately wanted. He had to spend night after night in the company of strange women. The mornings filled him with self-loathing.

The more he hated his wife the more he hated himself. He lashed out at her, on the rare occasions when he wasn't wallowing in self-pity. He thought at times that the war had messed him up. Or had he been messed up to begin with?

"Make it stop!"

Sonia glared across the bed at Rita. The latter looked stricken.

"My contact at the Dream Supply said he had tremendous usage each month. He uses it even when he isn't sleeping. He is consumed by his dreams."

"Sod your contact!" Sonia replied savagely.

The hospital room was back into focus. The woman stirred in her bed. She opened her mouth, but no words came out of it. The light in her eyes was gone.

He looked at her cold, white face with a touch of contempt.

Then, like a bolt of lightning he was struck by the realisation of her death, the *finality* of it. He staggered. An outpouring of grief inundated him. A deluge of guilt and remorse washed away all his resentment, all the grudges he had nursed against his wife for years.

“Come back!” he keened like a wounded animal, “Come back and give me a chance to make it right!”

Agony – that was the name of his Abyss. He was consumed by it, and dwelt inside of it.

Sonia looked at Rita. She could see her thoughts reflected in her sister’s face. The man’s memories had awakened their own Abyss.

At the end of Dreamland where the clouds met the sky, was a precious thing called happiness.

The words floated around like fluff, hollow like a cicada’s shell. The patchwork quilt was torn to shreds, exposing the Abyss called ‘Despair’ sleeping under it. A harmless little pet as long as it was bribed with happy dreams. But its true nature was something else. It was not untouched by grief, nor did it have the spirit to believe in miracles. It had witnessed death, known grief, was racked with guilt. It had the power to taint the sun and the moon, and everything under them.

“Damn!” Rita swore under her breath.

Gandharbika Bhattacharya is based out of Kolkata. Writing is her passion. Her short stories have been published in various online magazines. Studying Japanese and reading fiction are two of her favourite activities.

The History of the lost Bengali immigration in America

Vaswati Biswas

In the mosaic of America's immigration history, South Asian immigrants started immigrating to America from the late 18th century onwards.

The earliest recorded Indian immigrant to the United States was from Madras, who traveled to Salem, Massachusetts in 1790. In the diary of William Bentley, a pastor of the East Church in Salem, Massachusetts, he wrote," he had the pleasure of seeing for the first time a native of the Indies from Madras. He came with Captain J. Gibault and has been in Europe." Several Indians were brought by the seafaring Captains who worked for East India Company in India to America to serve their households as servants.

There is also a mention of a Bengali Lascar, Sick Keesar anglicized for Sheik Kesar. He filed a petition on November 3rd, 1785, at Pennsylvania's Supreme Executive Council in Philadelphia against John O Donell of the "Palas Indiaman (the ship where he worked as a lascar)." Keesar's petition proves evidence of the presence of East Indian lascars, slaves, and servants in colonial and postrevolutionary America. Kesar and his fellow lascars arrived in Baltimore aboard the Palas on August 12,1785. The Lascars were skilled sailors who worked for low wages. There were also advertisements for runaway East Indian servants in local newspapers, which signified South Asian presence in Colonial America.

However, the first significant presence of East Indians from the Indian subcontinent in the United States can be traced more than a century ago from the northern province of Punjab, India. They appeared on the western coast working in Washington's lumber mill, railroads, and California's agricultural lands. But around that same time, on the East Coast of America, Bengali-speaking immigrants from the states of West Bengal and Bangladesh, then undivided Bengal, arrived in the port cities of New York and Baltimore around 1885.

These immigrants were Muslim traders from a village in Hooghly, West Bengal in India. They arrived with silk embroidered merchandise, which was called Chikons, and they were known as Chikondars. They began to come with trunks laden with embroidered silk shawls, tablecloths, pillow covers, small rugs, and many other goods.

Between the 1880s and 1920s, these Chikondars made regular trips from Calcutta, a port city in West Bengal to the port of New York. They spent each summer selling their merchandise along the boardwalks of Atlantic City to vacationers and rich elite Americans who fancied and decorated homes with Oriental pieces. At the end of the season, few network members returned to India, while others made their way to the South, mainly to New Orleans, which became the network's main hub. The network also connected to other southern cities of Charleston, Memphis, Dallas, and Jacksonville- predominately ports or large cities.

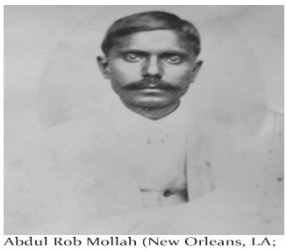

Abdul Rob Mollah (New Orleans, LA; St. Louis, MO; French Lick, IN), U.S. National Archives

Over the years, hundreds of Chikondars from Hooghly and Calcutta moved through these circuits, a small number settled in Detroit but notably in the South. Oriental countries captivated the imagination of the *Mardi Gras* organizers in New Orleans, and the Bengali silk traders' goods were used heavily to decorate many floats each year. These groups of Bengali immigrants married local Creoles of color, women with deep roots in the city, or African American women from the post-antebellum rural south. At that time, they were not allowed to marry whites. Most of these Bengali traders in New Orleans, settled in the neighborhood of Treme and by the 1920s set up clothing shops along the neighborhood's main commercial thoroughfare of North Claiborne Avenue.

FIRST COME... Peddlers from Hooghly who settled in the US at the turn of the 20th century — Rohim Bux, Abdul Rub Mollah, Roston Ally, Moksad Ali, Abdul Haque and Noorul Huck

Pics, courtesy US National Archives and descendants of Moksad and Ella Ali

One known Bengali Chikondar, Mokshad Ali moved to New Orleans and married an African American woman, Ella Blackman, in May 1895. Together they navigated race in an era of anti-Asian exclusion.

Moksad Ali, an Indian-American pioneer in New Orleans ca. 1900. His descendants include Chilli Thomas as well as Bardu Ali, the "Forrest Gump" of jazz.

The 1900, federal Census found 12 men from Hindoostan in New Orleans; by 1910, the population had increased by fivefold. Fatima Sheik, a writer and a current third generation from Oriental Chikondar in New Orleans made a documentary, named "The Bengali" with Kavery Kaul, a filmmaker. They both traveled to Khori village in Hooghly, India in search of Fatima's roots and documented it in the movie "The Bengali". Her grandfather, Shaik Mohammed Musa was a trader in New Orleans in 1896 and married Tinnie Ford, an African American woman and died in 1919. The "Bengali" documentary tells the untold story of ties between South Asians and Africans in the late 19th century. The men were Muslims, and the women were Christians- together they built families and assimilated into the communities of color. African American neighborhoods and communities provided these immigrants with shelter and the possibility to build lives. These immigrants' children were absorbed into the Black community within a generation. This is how the first Chikondars made their first networks in the colored communities of America.

There was another overlapping wave of Bengali immigrants traveling on the East Coast in the 1910s, and it grew into a steady stream during the First World War. The Bengali Chicondars paved the road for a wave of Bengali immigration of seamen. The Lascars or seamen jumped ship to escape unbearable conditions in the boat. These Bengali ship workers came from Sylhet, Noakhali, Chittagong, east Bengal, and now Bangladesh. The ship jumpers came to New York City and other eastern ports in the early 20th century and made Harlem their home. Most of the lascars population was of Bengali origin.

They married Puerto Ricans and African Americans as an alternate way of integrating into the new country. Partially due to this assimilation, their legacy in some of America's most diverse cities has been all but erased. Blending in the necessity of survival for these men as undocumented immigrants was essential. Many of these ship jumpers started working in factories and formed clandestine networks to help one another jump ships and make their way into the heart of New York City or travel inland to factory towns far from the port.

Ibrahim Chowdry, the first documented ship jumper of Bengal arrived in the 1920s. He came when immigration laws closed the US doors to Asians through the Asian Immigration Act of 1917 and 1924. Ibrahim Chowdry became a leader among the community of escaped Muslim Seamen, sheltered them, and helped them with immigration issues. In 1947, when East Bengal became part of independent Pakistan, Chowdhury helped found the Pakistan League of America, a social and political organization. In the 1950s he built ties with the African American Muslim groups in Harlem.

A banquet held in New York City in 1952 by the Pakistan League of Americ organization that was dominated by ex-seamen from East Bengal, which v part of Pakistan. Courtesy of Laily Chowdry

John Ali, a ship worker from the village of Sylhet, East Bengal jumped ship in Baltimore in the 1920s. He learned English listening to Radio, married a local African American woman, Mamie Chase, and had three children. He worked in factories in several places and finally settled in Detroit. Habib Ullah from Noakhali and Eshad Ali from Sylhet were 2 of the first seamen to establish Indian restaurants in New York City.

Habib Ullah, Sr., one of the earliest Bengali ex-seamen to settle in East Harlem. Courtesy of Habib Ullah, Jr.

Habib who jumped ship in the 1920s and spent years as a dishwasher and cook, opened the Bengali Garden Restaurant in Manhattan Theatre District in 1946. He ran it with his Puerto Rican wife, Victoria. Eshad Ali opened the Bombay Indian Restaurant in Harlem and ran it with the help of his African American wife, Ruth. It is interesting to note how Bengali Chikondars and Lascars formed families then. Also, all Indians, be they Sikh, Muslim, or Hindu were called Hindoos.

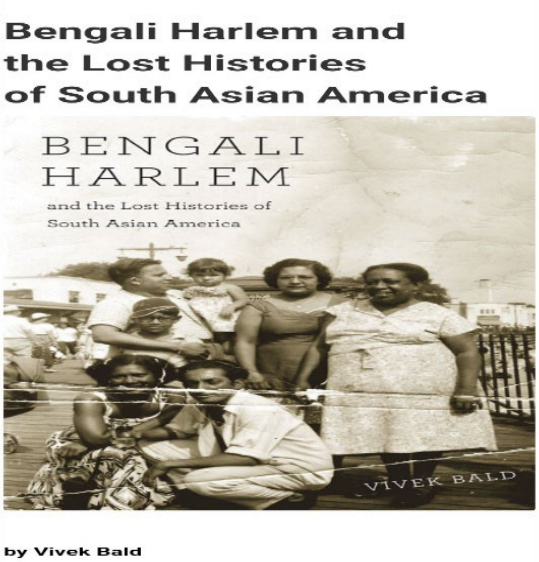

Until very recently, nothing was known of Bengali immigration to America. Vivek Bald, an assistant professor at MIT, has given a detailed account in his book, "Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America "based on meticulous research of steamship logs, immigration documents, census reports, newspaper articles, church records, and marriage registries.

These migrants largely stayed hidden from historical records and their stories were only passed down through family tradition and storytelling. It is not clearly known, when Bengali Laskars or ship jumpers stopped entry into the US but during the Great Depression in the 1930s, the Bengali seamen decided to stay away from the American ports and sought opportunities elsewhere in other countries. Similarly, the Bengali Chikon trade declined around 1925 and faded away by 1935. The Great Depression drastically reduced the demand for fancy goods from the Orient. In any case, the Bengali traders who had settled in the US gradually assimilated into American society. In India, they were treated as British subjects, upon arrival in the free country of the US with suspicion, surveillance, and isolation. The early Bengali immigrants who lived in America were uneducated and struggled to survive in an environment of racism and adversity. But they were resilient, maintained a low profile instead of confrontation, and became part of American history's complex tapestry. After 1965, the newer wave of South Asian immigrants was primarily educated doctors, engineers, and Ivy League graduates who seldom shared working-class struggles or promoted intercultural unity. These early Bengali immigration chains offer insights into the dying British Empire and the newly surging United States-throwing light into a relatively small, largely forgotten wave of Bengali immigration stories to the US.

Acknowledgment: Vivek Bald's "Bengali Harlem and the lost Histories of South Asian America" book, Internet and YouTube documentaries.

Photo courtesy: Internet & Vivek Bald's "Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America"

This article was initially written by the writer for an exhibition, "Journey of Hope" at the Museum of History, Charlotte, highlighting the early South Asian immigration, especially the Bengali community's journey from early days to today.

Vaswati Biswas was a longtime resident of upstate New York, she recently moved to Charlotte, North Carolina with her family. She is fond of reading, writing, nature and loves to explore history of various countries.

England and A New Beginning

Asish Mukherjee

Arrival

It was a crispy September evening when the aircraft started its descent into London. In the fading autumn light, Anil could make out the green English fields cloaked with a mantle of fluffy clouds. Westminster Abbey and House of Commons laced with glistening waters of the Thames started to come up towards him like a page from his history book. Soon the wheels hit the runway of another land in the chronicle of his life.

A flurry of activities ensued amongst the passengers as soon as the seatbelt sign was turned off. Anil leaned back in his window seat and closed his eyes for a moment. It seemed like he was crossing the edge of reality. He had been on a few trips abroad, but this was the first time he had decided to forsake the reality of his comfortable, limited life and enter the wider world to pursue a career. A blending of thrill and anxiety flooded his mind.

The British are paranoid about tuberculosis, thought Anil, as he made his way. Having ruled the Indian subcontinent for two centuries, the British knew that Tuberculosis was rampant there and almost uncontrollable. This is why Anil was required to carry a recent chest x-ray, which he bore like a flag as he gingerly fell in line with the passengers waiting for immigration clearance at Heathrow International Airport. When his turn came, his fears vanished as a pleasant-faced older gentleman reviewed his papers and declared in a Cockney accent, “Sir, you are lite.” Anil was quick to realize that the man was referring to his arrival being a month later than his start date on the appointment letter.

Anil said, “They know it. I am late because I lost my father.”

“Sorry to hear that, welcome to England, you can proceed. Your stay is granted for one year at this time.”

“And if I wish to visit my home during that period?”

“Ha, ha, you have thought about it all, haven’t you? Here you go.” With that, he banged a stamp on his passport that said visa was exempted for one year.

Anil thought he had conquered the world and went in search of his luggage. He soon located his ancient leather suitcase, worn out by many travels, and recently given a facelift by a cobbler in a Calcutta Street. It was heavy with textbooks, and one of the aluminum wheels the cobbler had hammered in with nails, had caved. Undaunted, he dragged his limping bag and looked for the signs of the “tube’ which is the popular name of the subway. As he emerged from the enclosed arrival hall, London burst upon him in all its brilliance across the tall glass walls. Shiny red double-deckers and antique black taxis beckoned to him like luminous spirits from a picture book. He felt he had gatecrashed into a Shangri La.

Coming out from his reverie, he resumed his search for the “tube.” Somehow, he managed to pull his clumsy burden onboard a crowded train moments before the doors swung shut. He got down at Liverpool Street as he was told to, by a friendly lady at Heathrow. This turned out to be a fair-sized railway terminus, and it took him a while to locate the train to Ipswich on the huge lighted display. To his horror, he noticed that it was leaving in three minutes. Anil ran, stumbled, crawled, and somehow got himself with his heavy baggage onto the train. A middle-aged man in a peaked hat said from a corner, “Good evening, Sir, that was quite some work. Do have a seat here”.

It was close to 1.30 a.m. when the train pulled into Ipswich. Anil sprang up and made for the door, thanking the fellow passenger who alerted him. He found himself in a rather lonely station. It was foggier and chillier than London, and there was no one in sight. He realized that he would need to take an overbridge to cross the tracks. Never dreaming that overbridges could have elevators, Anil dragged his heavy baggage with a Herculean effort, up the numerous steps. Unfortunately, one more wheel abandoned operation in the process.

He looked around and only saw a young couple in a deep embrace in a dark corner. Left with no choice, he went up to them and said apologetically, “Excuse me, can you tell me where to find a taxi”? The woman pointed to a sign in the distance displaying the unfamiliar term “Taxi Rank.”

The lady smiled at his surprised look and said, “You can take the next one, we’ll wait.”

Soon a taxi arrived, and a plump, pompous-looking fellow bellowed out “Where to”?

“To the hospital.”

“Which one, Sir”?

Anil consulted his papers and said,

“*The* Ipswich Hospital, on Heath Road, department of obstetrics”.

That is where he had been instructed to report.

The taxi took off along the smooth roads of a sleeping city and eventually stopped at the entrance to a big building. The driver opened the door and announced with a flourish, “*The* Ipswich Hospital, *Maternity*”.

Anil nervously rang a bell and told the driver to wait a bit. Miraculously, a man opened the door and soon brought a large platform cart to take the baggage. As Anil followed him down the branching corridors, music and loud voices reached his ears. The man laughed and said, “The residents are having a party.” Anil was in no mood for carousing and was glad to enter the small clean room that had been assigned to him. He made a call through the operator to his home to tell them he had arrived and pulled the blanket over his tired body.

A&E

A new day dawned on Anil, in a new country. He hurriedly looked at his watch and couldn’t believe his eyes. It was 10 a.m.! He had never slept so late in his regulated tropical life where the bright sun would wake him much earlier. He set forth to explore the area and came across people preparing breakfast in a well-stocked doctors’ kitchen. There was also a lovely common room, with snooker and table tennis (ping pong) boards. Anil now set forth in the direction of the Emergency Department where his assignment was due to begin the next day. He soon found the brick building that proclaimed in large white letters “Accident and Emergency.” This is the term used in England, A&E in popular verbiage. He identified himself to a pleasant young nurse who led him to the Doctors’ Office.

He was greeted by the director Dr. Shorabjee - a reserved, older person who, Anil learned later, was from South Africa. Sitting next to him was a younger, jovial white man Dr. Alan Stone, and a somber Asian man Dr. Eric Koser. The last-named person said he was from Sri Lanka and held the position of registrar. He handed Anil his schedule of duty hours and told him to report at 9 a.m. the next day.

The A&E department was very modern and well laid out. Two doctors were on duty during the day. They had an elegant office where they reviewed minor cases. Sicker patients were seen in well-equipped private cubicles. In addition, there was a procedure room and a room for orthopedic casts. Anil loved his work. Every new patient he saw opened a new world colored by a kaleidoscope of human shades – compassion, sacrifice, despair, suffering satisfaction, and possibly hope. Sometimes at the height of work, a nurse would come in and declare with a smile, "Doctor, Mrs. Brown has been waiting for long, can you please come and see her for a minute?" Anil came to know that this meant a kind nurse had prepared coffee for the tired doctor and wanted to give him a break!

During free times Anil took long walks along the city streets. Red-roofed houses lined the smooth sidewalks like a string of garnets, and most windows had a box with blooming autumnal flowers. He took deep breaths of fresh-cut grass and garden roses. Every now and then, a bright red mailbox and an equally bright phone booth still stood steadfast, as it had over the years. Though unfamiliar with this environment, he felt a deep intimacy with this serene living.

It did not take long for Anil to realize that weekends were the busiest times in A&E. There would be injuries from brawls, football games, and even domestic violence. One such Friday, he had fortified himself with a good dinner and had set forth for his 11-hour nocturnal stint.

"Hello doctor, let us get started with cubicle four without delay, can we?" chirped Stacey, one of the energetic nurses fresh out of school.

"What's up Stac?"

"There's an inebriated man with a lacerated forehead."

The cabin was filled with the stench of cheap alcohol, and a shabbily dressed, red-faced man with an untidy bandage on his forehead, looked up at Anil and said," I don't want him to touch me, get me a regular doctor, or I am leaving."

The allusion was obviously to Anil's ethnic origin. The nurses looked ashamed, and security appeared promptly, but Anil felt sorry rather than angry with this man who had failed to take the opportunities his country offered and had fallen into the dregs of society.

"Well, let me know if he changes his mind," said Anil.

As he turned away, he felt a tap on his shoulder. Sister Wood was motioning him aside. (Charge nurses are known as Sisters in the UK and India).

"Doc, there's an elderly man Robert, who has taken an overdose of Paracetamol (a medication similar to Tylenol), he needs immediate attention."

Anil went into the cabin and found a frail gentleman, probably an octogenarian with a shock of white hair and a sad look on his face, lying with his eyes closed.

"Quick, let us get him to the procedure room and pump his stomach," Anil called out.

Soon he was inserting a wide-bore red rubber tube down his throat, and a nurse was alternately pouring saline through a funnel at the other end and then lowering it to let the fluid out. This was producing a siphon action to clean the stomach of all the poisonous contents.

Suddenly, Anil heard a child crying in the background. Sarah, one of the experienced nurses whispered in Anil's ear, "Doc, if this man is stable, can you look at someone else now?" Sarah had a scar across her face for which Anil did not know the reason. It made her look sterner than she was.

Anil stepped into the next room and saw a little girl about eight years old, sitting on a stool. She looked like an immaculate little doll. Her blonde hair covered part of her face, and her blue eyes brimming with tears.

"Little Dora was playing with a dinner knife tonight, and accidentally cut her index finger", said Sarah as she patted the girl on her head.

Aside to Anil, Sarah said in a low voice, "Dora is very sad as she lost her ailing grandfather last week."

Sarah and Anil spent some time trying to calm the child down with false assurances of no pain or no stitch. Dora did not believe any of this and said, "When they took my friend to the hospital to get stitched, they gave her a chocolate."

After finishing the stitching, Anil made his way back to the old man's room. Sister Wood stopped him and handed him a letter. "This is the suicide note we found in Bob's pocket."

The note was short and said,

"Dear Lord, I stand before you, a lonely man with nobody to call his own in your universe. My life has no meaning or value. Please allow me to exit the world and please accept this failed man into your forgiving arms".

Anil entered and found Bob fully alert and awake.

"Doctor," Bob said in a low voice, "you gave me back my life, but not the reason to live."

The curtains behind Anil rustled, and he saw a child's pretty face wearing an inquiring look.

"Is this grandpa very sick doctor, like mine was?" asked Dora in a faltering tone.

"He was, but not anymore," said Anil.

Dora came in and touched the old man's frail arm with her tiny soft palm.

"Will you come home and play Grandpa with me from time to time?"

Bob looked at the child through his misty eyes. He took her hand gently.

A communication took place that had no language, a transaction was sealed that had no currency, and an indenture was bonded that had no stamp. A bridge was created between two lives that had never known each other but were both parched for affection in their own ways. Anil witnessed the miracle silently.

Tears rolled down the old man's creased face.

"Yes dear", he whispered.

"This is Dr. Charles Hubert," said a friendly voice behind Anil. "I will take over from here."

"Hey man," it has been a busy night for you, take a break," said Charles to Anil.

As he started to leave, Anil looked up at the whiteboard where Sarah always wrote a message for the day.

It said, "Life does not end, it always has a new beginning."

Asish Mukherjee, a resident of Maumee, Ohio, USA. is a physician by profession; he loves writing, computers, and travel.

Romancing with mighty River Danube

Champak Sadhu

A year-long intense planning across the globe, trials and tribulations, contemplation, anticipation, and exhilaration finally came to fruition on 30 June 2023 when eight of us flew into Munich from different parts of the world.

Partha Sarathi Sadhu from Kolkata, India; Deepashree Dutta from Lexington, Kentucky, USA; Eva and Arun Dey from Calgary, Alberta, Canada; Maitrayee Ganguly from Vestal, New York, USA, Dolon and Arup Datta from Calgary, Canada; Champak Sadhu from Sugar Land, Texas, USA.

It is often said that rivers have the power to simultaneously divide and connect people. There is perhaps no other waterway in Europe that embodies this paradox more completely than the mighty Danube, the longest river in the European Union. During the 7th century, the Danube became the pathway for the transport of invading forces. In Roman times, the river separated the Roman Empire from barbarian tribes that resided in the lands beyond its left bank. Only Trajan, the philanthropic soldier-emperor under whom the Empire achieved it greatest geographical reach, marched across the river near today's Drobeta in Romania and conquered what was then Dacia, adding the country's gold to the wealth of Rome.

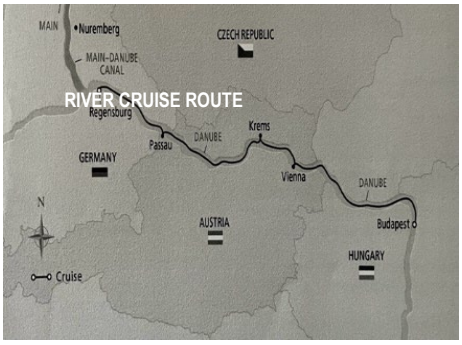

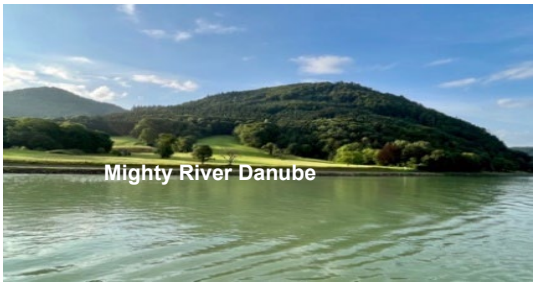

Our romance with the Danube, the river, began on Day 3 (07/03/23) from Passau, Germany, of our Viking Danube cruise encompassing four countries, Germany (Regensburg, Passau), Austria (Krems, Vienna), Slovakia (Bratislava) and Hungary (Budapest).

Due to the low water level at Regensburg, which was the scheduled starting point of the cruise, it had to be changed to Passau, which was our original day three destination.

No matter which side we are on this issue, climate change is not a hoax but real. Unless our next generation and the generation thereafter try to mitigate climate change, there will not be a river cruise in the near future! From Munich airport, we had to be driven to Passau by bus to embark onto our ship. It was a nonstop two-hour ride.

Founded by the Celts more than 2,000 years ago, Passau is one of Bavaria's oldest cities, known as the "City of Three Rivers", it rests at the confluence of the Inn, Ilz, and Danube Rivers. A major attraction is the magnificent 17th-century St. Stephan's Cathedral - the baroque wonder that houses Europe's largest pipe organ with more than 17,000 pipes, 200 stops, and four carillons. All the five parts of the organ can be played from the main keyboard. During the Renaissance and early modern period, it used to be a prolific sword manufacturing center.

Regensburg is a true medieval city untouched by World War II bombing and rich in architectural splendor. Regensburg is also one of Germany's best-preserved cities and a UNESCO World Heritage Site. Due to the low water level, we covered the city by bus on Day 2. Scenic Regensburg is Bavaria's fourth largest city and home to several examples of the Romanesque Basilica style, including the Church of St. James, dating to the 12th century, and the 13th-century abbey church of St. Emmeram- noteworthy for its detached bell tower. Dom St. Peter or Regensburg Cathedral has existed since about 700 AD. Due to several devastating fires, the church was rebuilt, and the current high Gothic-style building was completed in 1320. The cathedral's footprint is 279 feet by 115 feet wide. Thanks to the low water level situation, after three days of exploring Passau - Regensburg - Passau on land, we finally set sail that evening on the Danube.

DOM ST. PETER OR REBENSBURG CATHEDRAL

In the morning on Day 4, we docked at Krems in Austria. A small university town at the eastern end of the Danube's Wachau Valley, Krems is surrounded by terraced vineyards. In its heyday, during the 12th century, Krems held even more importance than Vienna for its iron, grain, salt, and wine trade.

Although Gottweig Abbey boasts no shortage of splendor, its most impressive room might be the relatively small library stacked to the ceiling with 130,000 volumes! The stretch of Danube between Krems and Melk, known locally as "the Wachau," is possibly the loveliest and most picturesque stretch along the entire length of this majestic river. A scenic bus ride took us to the abbey, located on a hilltop overlooking splendid Wachau Valley and the Danube River.

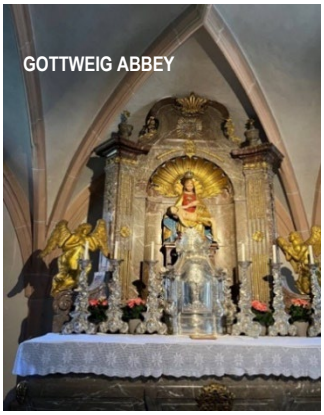

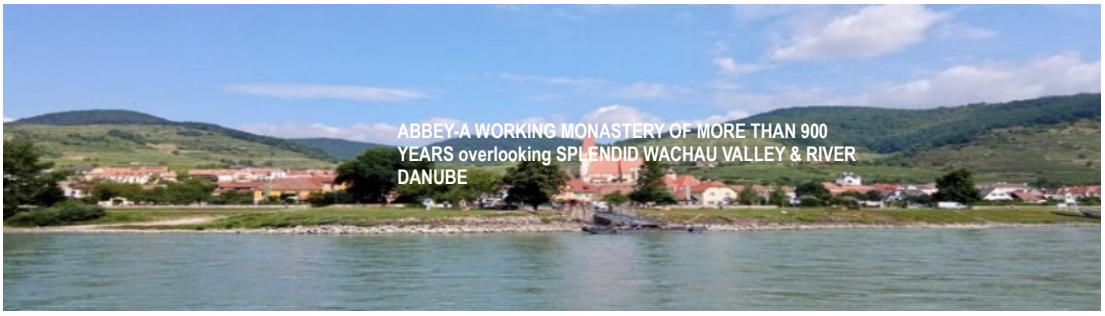

On Day 5, we reached Vienna, the capital city of Austria renowned as the “City of Waltzes”. The center of arts and intellect during the reign of the Hapsburgs and beyond, Vienna dances to a tempo all its own. One simply marvels at the great Gothic St. Stephen’s Cathedral, crowned with a gleaming spire, majestic towers and colorful roof line and of course the imposing Schonbrunn Palace, an imperial summer residence during the reign of Maria Theresa. Not to be missed is the beautiful State Opera Concert Hall, its façade adorned with elaborate frescoes depicting Mozart’s opera The Magic Flute. An evening of live classical concerts at the historical Palais Auersperg, where Mozart and Haydn are said to have performed, was indeed exhilarating and upheld the reputation of Vienna for its musical legacy.

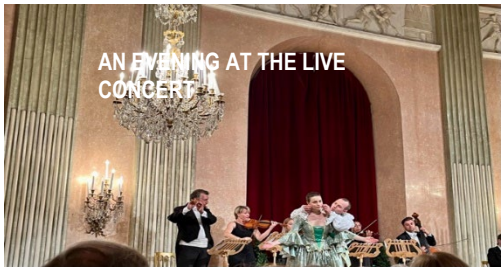

Well worth the optional whole day (Day 6) land tour from Vienna was the breathtaking picturesque Bratislava, the capital of Slovakia that is set along the Danube River and is the only capital in the world bordering two countries- Austria and Hungary. It is known for its rich history and culture – historical buildings and well-preserved monuments, some of which date back to the 12th century.

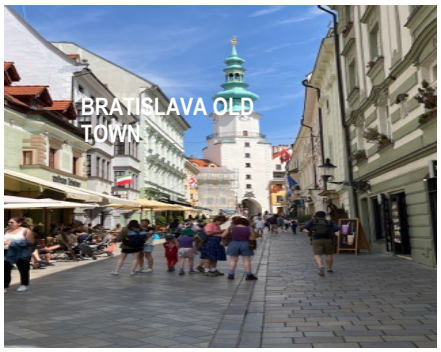

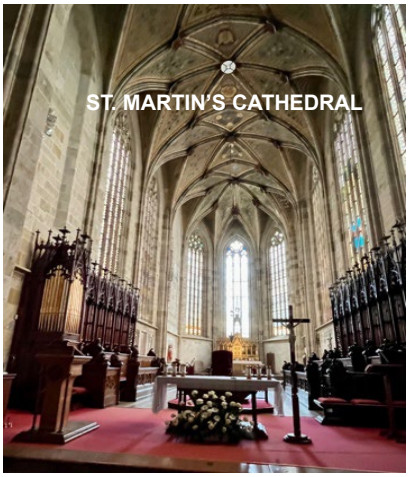

The cruise terminated the next day at the ever-fascinating Budapest, Hungary's capital, that is bisected by the river Danube. Its 19th-century Chain Bridge connects the hilly Buda district with the flat Pest. A funicular railway runs up Castle Hill to Buda's Old Town for some majestic views and where the Budapest History Museum traces city life from Roman times onward. Trinity Square is home to the 13th-century Matthias Church and the turrets of the Fishermen's Bastion, which offer sweeping views.

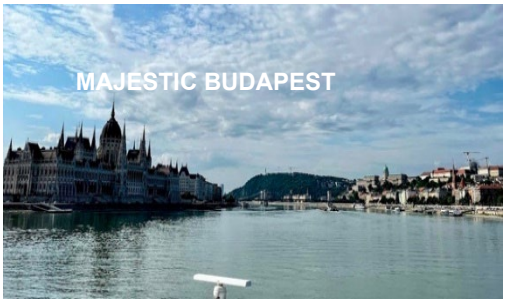
MAJESTIC BUDAPEST

BUDAPEST CASTLE DISTRICT

BRIDGE CONNECTING BUDA & PEST

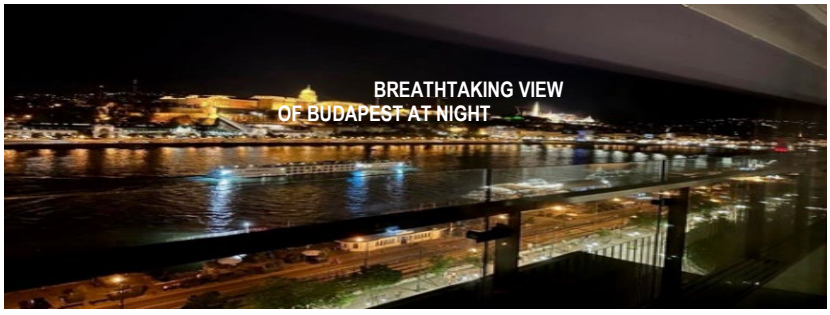
BREATHTAKING VIEW
OF BUDAPEST AT NIGHT

I have been to a number of ocean cruises, but in my opinion, the river cruise is altogether a unique and intimate experience since there are only 200-300 passengers, whereas ocean cruises deal with 2000-3000 guests. River Cruise provides you with an up-close and personal service which begins with the captain.
Most importantly, the eight of us in the group christened ourselves “Octet” in keeping with the lyrical journey and were always in sync with each other, which made this a once-in-a-lifetime experience.

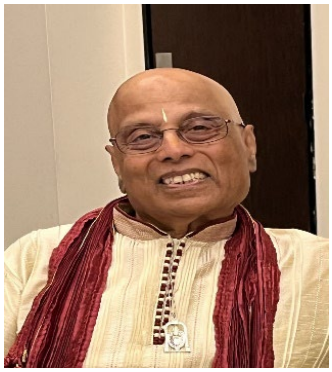

Champak Sadhu lives in Houston, Sugar Land, Texas. He has been associated with various religious and cultural organizations of the Indian and Bengali Communities in Houston, for close to five decades.
Professionally he has been engaged since 1969in providing design and technical leadership globally on Design-build projects for DOD and other industrial and commercial stakeholders. Retired in 2022

Greater Binghamton Bengali Association (GBBA) Durga Puja 2023
October 28, 2023 (Saturday)
at
India Cultural Center, 1595 NY-26, Vestal, NY 13850

We are pleased and honored to announce that the traditional Greater Binghamton Community (GBBA) Original Durga puja will be celebrated at ICC Cultural Center, Vestal, on October 28, 2023.

We would also have added attraction this year to perform Kojagari Lakshmi Puja on the same evening as Lakshmi Purnima falls on that evening. We keenly look forward to your participation and support.

Venue: ICC Cultural Center, Vestal
Date: October 28, 2023, Saturday
Events Puja, Prasad, Lunch, Arati, Dinner

Invited Artist: Priyani Vani

-

Puja Timings:

Morning Session			Evening Session	
8:30 AM - 12:30 PM	Puja (Anjali at 12:15 PM)		5:30 PM - 7:45PM	Lakshmi Puja & Local Program
12:30 PM - 12:45 PM	Prasad		7:45 PM - 8:30 PM	Veg / Non-Veg Dinner
1:00 PM - 2:00 PM	Vegetarian Lunch		8:30 PM - 11:00PM	Invited Artist
3:00PM - 4:45 PM	Break		During Break	Dessert
4:45 PM	Back at ICC			

Website: WWW.gbbapuja.org

Priyani Vani is a noted singer, actor, and TV host in India. The singer is from Indore, Madhya Pradesh. Now she is based in Mumbai. She did an acting course at Grace Acting Academy, Mumbai. She has also been a part of a documentary film. Priyani sang Dil Tere Bin Lagda Nahi Soniye with Kunal Ganja Wala in 2011.

Vani has participated in many singing reality shows. Priyani first participated in a show called Sa Re Ga Ma Challenge in 2005. The singer was one of the finalists in the show. She participated in the show Amul Star Voice of India. It was a singing competition, telecast in 2007. Vani was one of the wildcard entrants in the show and went on to be in the top 8.

Apart from being a full-time singer, she is also a TV host. She has hosted two TV shows telecasted on Focus TV and ETV Urdu. The curly-haired singer wants to pursue singing and acting in the future. She aspires to host more TV shows as well.

Cover Page Painting:

Mahabrata Mondal, niece of Ashim Datta, was born and raised in Krishnagar, West Bengal. She was an ardent lover of various art and cultural activities from her childhood and specialized in drawing and painting. By profession, she is a school teacher and owns a boutique shop.

Picture taken in and around Bengal, India, and composed by Anasua Datta.

Greater Binghamton Bengali Association (GBBA) acknowledges the overwhelming support and contribution from everybody to continue with all the cultural activities throughout the year. May the essence of togetherness prevail among us with good vibes.